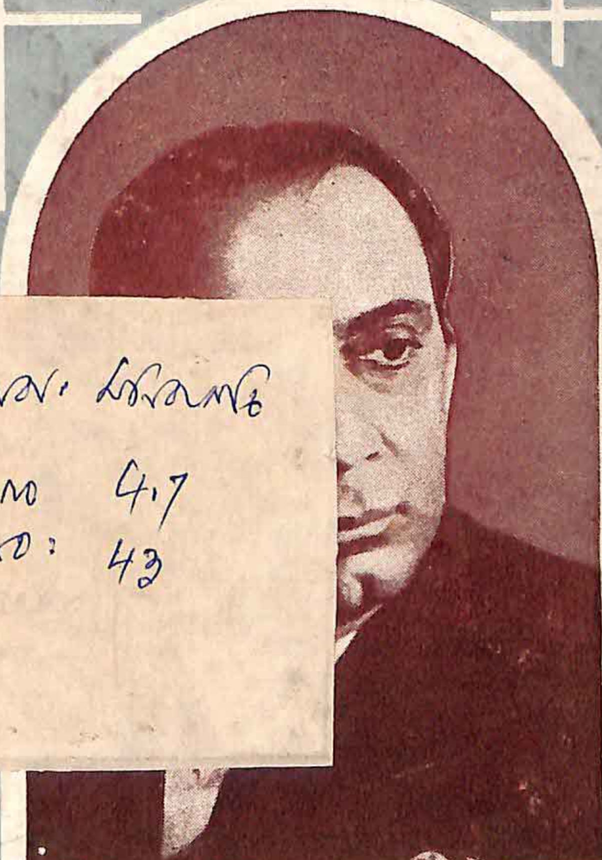
পরমাণু বিজ্ঞানী

ডঃ ভাবা



পরমাণুবিজ্ঞানী ভাবা

(মণি বাগচি)

শৈব্যা পুস্তকালয় ● ৮।১সি শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

প্রকাশক ঃ
রবীন বল
৮/১এ, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা ১২

প্রথম প্রকাশ ঃ বুদ্ধপূর্ণিমা ১৩৮৫

প্রচ্ছদ ঃ রঞ্জিত দাস

মূল্য ঃ চার টাকা

মুদ্রক ঃ
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঘোষ
নিউ মানস প্রিন্টিং
১/বি, গোয়াবাগান স্ট্রীট
কলিকাতা-৬

ভূমিকা

যাঁদের অক্লান্ত সাধনায় আজ ভারত বিশ্বের বিজ্ঞান সভায় সুপ্রতিষ্ঠিত হোমি জাহাঙ্গীর ভাবা তাঁদেরই অন্যতম। তাঁর অতুলনীয় অবদান ভারতবর্ষকে এক বিশিষ্ট মর্যাদায় ভূষিত করেছে—ভারতকে বিশ্বের অন্যতম পারমাণবিক শক্তিধরের মর্য্যাদা দিয়েছে। এই যে আমাদের দেশ আ'জ পরমাণুর যুগে পৌঁছে গেছে—এর সকল কৃতিত্ব একজনেরই। তিনি ডক্টর ভাবা। এই মহাশক্তিকে সমাজ কল্যাণে ও দেশের উন্নয়নে প্রয়োগ করার কথা পৃথিবীতে তিনিই প্রথম বলেছেন।

এই বিশ্ববিশ্রুত বিজ্ঞানীর প্রতিভা দীপ্ত ছাত্র জীবন, নিরলস উদ্যমে পূর্ণ কর্ম জীবন ও তাঁর বৈজ্ঞানিক অবদানের কথা যেমন জানবার বিষয়, তেমনি অন্যদিকে তাঁর স্বদেশ প্রেম, সংস্কৃতি ও চারুকলার প্রতি সহজাত অনুরাগ এবং সকলের ওপর উদার মানবিকতার আদর্শে উদ্বুদ্ধ তাঁর হৃদয়—এই সবও আলোচনার যোগ্য।

এই ছোট্ট বইটিতে তোমরা পাবে এই প্রতিভাধর বিজ্ঞানীর জীবন-কথা আর তাঁর কর্ম-কৃতির একটা সংক্ষিপ্ত পরিচয়। তোমরা বড়ো হয়ে এঁর বিষয়ে আরো অনেক কিছু জানতে পারবে—জানতে পারবে কেন তাঁকে বলা হয় ভারতে পরমাণু বিজ্ঞানের জনক।

মণি বাগচি

উৎসর্গ

হোমি জাহাঙ্গীর ভাবা

মানুষ ও সমাজের কল্যাণের জন্য পরমাণুকে শান্তির কাজে ব্যবহারের আবেদন জানিয়ে বিশ্বের রাষ্ট্রপ্রধানদের চমৎকৃত করেছিলেন ডক্টর হোমি জাহাঙ্গীর ভাবা। তিনি ছিলেন আমাদের উজ্জ্বলতম বিজ্ঞানীদের অন্যতম। তিনি নিজে যেমন অনন্য সাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন, তেমনি হাজার হাজার তরুণ বিজ্ঞানীদের তিনি উৎসাহ দিয়েছেন। তাঁর অকাল মৃত্যুতে বিজ্ঞান জগৎ এবং আমাদের দেশের প্রভূত ক্ষতি হয়েছে। ভবিষ্যৎ ভারত, পারমাণবিক যুগের সঙ্গে তাল রেখে অগ্রগণ্য দেশগুলির পাশেই যে রয়েছে সে শুধু তাঁর জন্য। হোমি ভাবার কাছে ভারতের ঋণ শোধ করার নয়।

রাষ্ট্রপতি সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ

২৫. ১. ৬৬

॥ এক ॥

ক্লাসে সাধারণ জ্ঞানের পরীক্ষা হচ্ছিল।

সেদিন স্কুল-পরিদর্শক এসেছেন ক্যাথিড্রাল স্কুলে।

এটি বোম্বাই শহরের খুব নামকরা উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়। স্কুলের একেবারে ওপরের ক্লাসে ঢুকলেন হেডমাস্টার ইনসপেক্টারকে সঙ্গে করে। ছাত্ররা সবাই একসঙ্গে উঠে তাঁদের দু'জনকেই অভিবাদন জানায়।

—তোমরা সবাই এবার বেঞ্চিতে বসো। ইনসপেক্টার সাহেব তোমাদের মুখে মুখে সাধারণ জ্ঞানের প্রশ্ন করবেন। বললেন হেডমাস্টার। সামনের একটি বেঞ্চিতে পাঁচজন ছাত্র বসেছিল। তাদের দিকে তাকিয়ে ইনসপেক্টার বললেন—'বোর্ডে আমি একটা নাম লিখছি। এঁর বিষয়ে তোমরা কি জানো, অল্পকথায় বলবে। তিনি কোন দেশের মানুষ, কি তাঁর জাতি আর কি জন্যেই বা তাঁর পৃথিবী-জোড়া নাম?'

এই বলে ইনসপেক্টার সাহেব একটি চকখড়ি নিয়ে কালো বোর্ডের ওপর লিখলেন ইংরেজীতে একটি নাম—'Albert Einstein. শুধু সামনের সেই বেঞ্চির পাঁচটি ছাত্র নয়, ক্লাসশুদ্ধ ছাত্রের দৃষ্টি বোর্ডের ওপর নিবদ্ধ হয়। এক মিনিট দু'মিনিট করে পাঁচ মিনিট কেটে গেল। ছেলেরা সব একে অন্যের মুখের দিকে চেয়ে আছে।

—তোমাদের মধ্যে কেউকি এই নামের সঙ্গে পরিচিত নও? জিজ্ঞাসা করলেন ইনসপেক্টার। তখন সামনের সেই বেঞ্চিটা থেকে একটি ছেলে উঠে দাঁড়াল। প্রতিভাদীপ্ত চেহারা, দুই চোখে তার উজ্জ্বল দৃষ্টি আর দেখতে অতি সুদর্শন।

—Yes Sir, I know the name.

—Then tell me briefly what do you know about him.

তারপর সেই ছাত্রটি উত্তর দিলো—'আলবার্ট আইনস্টাইন একজন পৃথিবীবিখ্যাত তত্ত্বীয় পদার্থবিজ্ঞানী। তিনি জাতিতে ইহুদী, থাকেন জার্মানিতে। তিনি শুধু অঙ্ক কষে এমন একটি মৌলিক তত্ত্ব উদ্ভাবন করেছেন যার ফলে এই পৃথিবী সম্পর্কে আমাদের আগেকার ধারণা পালটিয়ে গেছে।'

—সেই তত্ত্বটার নাম কি?

—Theory of Relativity অর্থাৎ আপেক্ষিকতাবাদ। এই তত্ত্ব প্রবর্তিত হওয়ার পর নিউটনের মহাকর্ষ তত্ত্ব (Theory of gravitation) এখন অচল হয়ে গেছে।

—তুমি এত কথা জানলে কেমন করে?

—আমার বাবা আমার পড়ার জন্য একটা ছোট লাইব্রেরি করে দিয়েছেন। সেই লাইব্রেরিতে আছে শুধু বিজ্ঞানের ভালো ভালো সহজ বই। তারই একটা পড়ে আমি আইনস্টাইন ও তাঁর এই যুগান্তকারী আবিষ্কার সম্বন্ধে এইসব কথা জেনেছি।

—Very good! Very good.

ছাত্রটির উত্তরে ইনসপেক্টার এমন খুশি হয়েছিলেন যে তিনি তাকে পঁচিশ টাকার মত বই প্রাইজ দেবার জন্য হেড মাস্টারকে নির্দেশ দিলেন। এক সপ্তাহের মধ্যেই ছেলেটিকে ঐ টাকায় চারখানি বিজ্ঞানের বই কিনে দেওয়া হয়েছিল।

এই ছাত্রটির নাম হোমি জাহাঙ্গীর ভাবা। ইনিই উত্তরকালে

বিশ্ববিখ্যাত পরমাণু-বিজ্ঞানী হিসাবে পৃথিবীজোড়া খ্যাতি অর্জন করেন এবং ভারতীয় পরমাণু কমিশনের চেয়ারম্যান নিযুক্ত হয়েছিলেন।

পৃথিবীর ইতিহাসে আমরা দেখতে পাই এক-একটা জাতির জীবনে কখনো কখনো এমন এক স্বর্ণযুগ আসে, যখন সাহিত্য বিজ্ঞান শিল্প সংস্কৃতির সমস্ত বিভাগে নানা প্রতিভার বিকাশ ঘটে। ইংলণ্ডের ইতিহাসে এমন একটি যুগ এসেছিল রাণী প্রথম এলিজাবেথের রাজত্ব-কালে যখন একাধিক প্রতিভাবান মানুষ জাতীয় সংস্কৃতির সকল ক্ষেত্রে তাঁদের অনন্যসাধারণ অবদানের পরিচয় রেখে গেছেন। ভারতবর্ষে এমন এক গৌরবোজ্জ্বল যুগ আমরা দেখতে পাই উনিশ শতকে। এই স্মরণীয় যুগের সূচনা হয়েছিল রাজা রামমোহন রায়ের আবির্ভাবের পর থেকে। তাঁর কল্যাণ হস্তের স্পর্শে নবজাগরণের যে আলোকশিখা সেদিন জ্বলে উঠেছিল তারই অনির্বাণ ছটা এসে ছড়িয়ে পড়েছিল দেশের সংস্কৃতির সকল ক্ষেত্রে। দিকে দিকে নবীন প্রাণের সমারোহ।

তখন থেকে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে কত মনীষী, কত মহাপ্রাণ মানুষের আবির্ভাব ঘটতে থাকে। উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে ইতিহাসের দিগন্ত। একে একে এলেন কত মহাজন। সাহিত্য, বিজ্ঞান, ধর্ম, শিক্ষা, শিল্পকলা, রাজনীতি প্রভৃতি জাতীয় জীবনের এমন কোন দিক রইল না যেখানে প্রতিভার সঞ্জীবনী স্পর্শ পড়েনি তখন। মৃতপ্রায় জাতির জীবনে সেদিন এইভাবেই এসেছিল প্রাণের জোয়ার। প্রাণ যখন জাগে তখন এমনি করেই জাগে—ইহাই ইতিহাসের নিয়ম।

উনিশ শতকের ভারতীয় নবজাগরণের এই উত্তরাধিকার নিয়ে বিশ শতকের সূচনায় বোম্বাইয়ের এক সম্ভ্রান্ত ধনী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন হোমি জাহাঙ্গীর ভাবা। এই শতাব্দীর গোড়ার দিকে মহাবিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইন যখন জড় ও শক্তিকে পরস্পরের পরিপূরক নির্দেশ করে আধুনিক পদার্থ বিজ্ঞানের ভিত্তি স্থাপন করেন

ও জড়বিজ্ঞানের তত্ত্বীয় আলোচনায় যুগান্তর আনেন—বিজ্ঞানের সেই প্রখর যুগেই জন্মেছিলেন ভাবা।

ভাবার কথা বলার আগে এখানে আইনস্টাইন ও তাঁর উদ্ভাবিত থিওরি অব রিলেটিভিটি বা আপেক্ষিকতাবাদ সম্বন্ধে দু-এক কথা বলা দরকার। এক হিসাবে পৃথিবীতে তাঁকেই পরমাণুবিজ্ঞানের পথিকৃৎ বলা চলে। আলবার্ট আইনস্টাইন (১৮৭৯-১৯৫৫) দক্ষিণ জার্মানীর উল্‌ম শহরে এক সঙ্গতিসম্পন্ন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর যৌবনকালের বেশির ভাগ অতিবাহিত হয়েছিল মিউনিকে। এনট্রান্স পরীক্ষা পাশ করে তিনি জুরিখ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। তখন থেকেই তিনি আকৃষ্ট হন বিজ্ঞান জগতের রহস্য উদঘাটনে। তাঁর আয়ত চোখ দুটির দৃষ্টিতে ছিল একই সঙ্গে চিন্তার গভীরতা আর বিশ্বরহস্য উদ্‌ঘাটনের জন্য সদাঅনুসন্ধিৎসু ব্যগ্রতা।

বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক হয়ে আইনস্টাইন চাকরি নিলেন সুইজারল্যাণ্ডের বার্ণ শহরের একটা পেটেণ্ট অফিসে। কাজ করতেন আর কাজের অবসরে খাতা-পেনসিল নিয়ে নিবিষ্টচিত্তে অঙ্কের পর অঙ্ক করতেন। তাকিয়ে থাকতেন দূর আকাশে নক্ষত্রের দিকে—তাদের সঙ্গে কল্পনায় তিনি যেন কথা বলতেন। তারপর ১৯০৫ সালে বার্লিনের একটা বৈজ্ঞানিক পত্রিকায় ত্রিশ পাতার একটা প্রবন্ধ বেরুল আইন-স্টাইনের। সেই প্রবন্ধটির মধ্যে বিজ্ঞান জগতের যে একটি যুগান্তকারী বার্তা নিহিত ছিল—যার ফলে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের গঠন ও জড়পদার্থের গুণাবলী সম্পর্কে আমাদের এতদিনকার ধারণা আজ বদলিয়ে গিয়েছে, তখন তা কেউ উপলব্ধি করতে পারেনি। এর পনর বছর পরে যখন ঐ প্রবন্ধটির ইংরেজি অনুবাদ 'Relativity, the Special and General Theory'—এই নাম দিয়ে প্রকাশিত হলো, তখন সমগ্র বিশ্বের বিজ্ঞানী সমাজে, বিশেষ করে পদার্থবিজ্ঞানী ও গাণিতিকদের মধ্যে এক তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি হলো।

কেন এই আলোড়ন হয়েছিল জানো? নিউটনের সময় থেকে

বিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল যে, জড়পদার্থকে সৃষ্টি করা যায় না, ধ্বংসও করা যায় না। আইনস্টাইন অঙ্ক কষে প্রমাণ করলেন যে এই ধারণা একেবারেই ভুল। তিনি বললেন জড়পদার্থকে শক্তিতে রূপান্তরিত করা যায় আর শক্তিকে জড়পদার্থে। তাঁর এই সিদ্ধান্তটি তিনি ছোট একটি সমীকরণের[১] ভেতর দিয়ে প্রকাশ করেন। পৃথিবীর বুকে জন্ম নিলো একটা নতুন বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব। ব্রহ্মাণ্ড, স্থান, কাল ও মহাকর্ষ (Gravitation) সম্পর্কে মানুষের এতকালের ধারণা একেবারে পরিবর্তিত হয়ে যায়। প্রথমটায় কেউ বিশ্বাস করতেই পারেনি যে, জড়পদার্থকে শক্তিতে রূপান্তরিত করা যায় আর শক্তিকে জড় পদার্থে। এই তত্ত্বের নামই আপেক্ষিকতাবাদ। ল্যাবোরেটরির পরীক্ষায় এই তত্ত্ব যথার্থ বলে যখন প্রমাণিত হলো তখন বিজ্ঞানীরা এই সিদ্ধান্ত মেনে নিলেন।

পদার্থবিজ্ঞানে আইনস্টাইনের প্রবর্তিত মতবাদ মূলত—দুটি সিদ্ধান্তের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। প্রথমত, কোন বস্তুর গতি কখনো নিরপেক্ষ হওয়া সম্ভব নয়; দ্বিতীয়তঃ, স্থান ও কাল পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত অর্থাৎ আপেক্ষিক, ওর একটিকে বাদ দিয়ে অপরটির অস্তিত্ব সম্ভব নয়। কোন বস্তুর গতি অপর কোন স্থির বস্তুর পরিপ্রেক্ষিতেই নির্ধারিত হতে পারে মাত্র। কিন্তু বিশ্বচরাচরে কোন বস্তুই স্থির নেই, পৃথিবী, গ্রহ, নক্ষত্রাদি সবই মহাশূন্যে গতিশীল। সুতরাং পদার্থের অন্য নিরপেক্ষ নিজস্ব গতি নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। কাজেই সব রকম গতি আপেক্ষিক। এভাবে আবার স্থান এবং কালও আপেক্ষিক। সেইহেতু মহাশূন্যে ভ্রাম্যমাণ বস্তুর অবস্থান অনুযায়ী সময় ও সময় অনুযায়ী অবস্থান হতে বাধ্য। আইনস্টাইনের এই মতবাদের বিস্তৃত যুক্তিতে পদার্থের পারমাণবিক শক্তিসম্বন্ধীয় বিবিধ সত্য প্রমাণিত হয়েছে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মূল গঠন বৈচিত্র্য একই নিয়মে গ্রথিত হয়েছে

---

১ আইনস্টাইনের সমীকরণটি ছিল $E = mc^2$; এর অর্থ 'Energy equals mass times the square of the speed of light'

এবং জ্যোতির্বিদ্যার বিভিন্ন অভিনব তথ্য উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। বহু জটিল যুক্তি ও গাণিতিক সমাধানের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত আপেক্ষিকতাবাদ বিজ্ঞানীদের বীক্ষণাগারেও নির্ভুল বলে প্রমাণিত হয়েছে।

এই তত্ত্ব আবিষ্কৃত হওয়ার ফলে নিউটনের পৃথিবীর অস্তিত্ব আর রইল না; সেখানে তখন জন্ম নিল এক নতুন পৃথিবী—আইনস্টাইনের পৃথিবী। এই মৌলিক আবিষ্কারের জন্য ১৯২১ সালে আইনস্টাইনকে পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়। ১৯৫৫ সালে ছিয়াত্তর বছর বয়সে মানববন্ধু ও মানবতার উপাসক আইনস্টাইনের মৃত্যু হয়। সারা জীবন ধরে যে মানুষটির দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল সুদূর নক্ষত্রলোকের দিকে, তিনি যে সহৃদয়তার সঙ্গে তাঁর আশপাশের মানুষকেও দেখতে চেষ্টা করেছেন—এইটাই তো তাঁর চরিত্রের মহত্ত্ব, আর জীবনের পরম গৌরব।

পরমাণুবিজ্ঞানী ভাবার জীবন ঠিক এই রকম উন্নত আদর্শে উদ্বুদ্ধ ছিল। তিনি বলতেন—'আমার ছাত্রজীবন থেকেই আমি এই মহাবিজ্ঞানীর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলাম। জীবনের অর্ধশতাব্দীকাল তিনি বিজ্ঞানের গবেষণায় নিযুক্ত ছিলেন। শুধু কাগজ আর পেন্সিল দিয়ে তিনি নব্য পদার্থবিজ্ঞানের জন্ম দিয়েছেন। বিজ্ঞানের ইতিহাসে এমন প্রতিভা বিরল। কেবলমাত্র বিজ্ঞানী হিসাবেই আইনস্টাইনের পরিচয় সম্পূর্ণ নয়। বিজ্ঞানের প্রাঙ্গণ পেরিয়ে সংগীতের ক্ষেত্রেও ছিল তাঁর স্বচ্ছন্দ বিচরণ। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বেহালাবাদকদের মধ্যে আইনস্টাইন ছিলেন একজন। সকলের ওপর মানুষ হিসাবে তাঁর যে পরিচয় তা এই বিজ্ঞানীর চরিত্রকে আরো মহীয়ান ও গরীয়ান করেছে।'

॥ দুই ॥

এক সময় আমাদের দেশ ছিল সমস্ত পৃথিবীতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের এক শ্রেষ্ঠ পীঠভূমি। তখন দেশ-দেশান্তর থেকে অনেক শিক্ষার্থী জ্ঞানলাভের আশায় ভারতের তক্ষশিলা, নালন্দা, কাঞ্চী, বিক্রমপুর প্রভৃতি শিক্ষার পীঠস্থানগুলিতে আসত। গণিত, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, স্থাপত্যবিদ্যা, আয়ুর্বেদ প্রভৃতি বিজ্ঞানের নানা শাখায় ভারতীয় বিজ্ঞানীদের অবদান তখন সমস্ত বিশ্ববাসীর শ্রদ্ধা ও সম্মান অর্জন করেছিল। কণাদ, আর্যভট্ট, নাগার্জুন প্রভৃতি বিজ্ঞান-সাধকদের নাম তখন সারা পৃথিবীর লোক জানত।

ভারতের এই গৌরবোজ্জ্বল যুগের পর এলো এমন এক অন্ধকার যুগ যখন জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রদীপ্ত শিখা নিভে যায়—তখন শুধু তার্কিক আর নৈয়ায়িক আলোচনায় ভারতবাসীর মন আবিষ্ট ছিল। ফলে বিজ্ঞানচর্চার আসর থেকে ভারত হারালো তার গৌরবের আসন। দাতার আসন থেকে ভারত নেমে এলো গ্রহীতার দলে। পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানের দানই সে তখন দু'হাতে গ্রহণ করতে লাগল, বিজ্ঞান-জগতে নিজস্ব কিছু দান করার যোগ্যতা তার আর ছিল না।

তারপর আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু ও আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় তাঁদের

অনন্যসাধারণ অবদান নিয়ে বিশ্বের বিজ্ঞানসভায় উপস্থিত হলেন, তখন থেকে এই অবমাননার যুগের হলো অবসান। আধুনিক বিজ্ঞান-যুগে এই দু'জনই প্রথম দেখালেন—ভারত ভিক্ষুক নয়, ভারতেরও নিজস্ব কিছু দেবার আছে। এই দুই বিজ্ঞানীর—এঁদের মধ্যে জগদীশ চন্দ্র ছিলেন পদার্থবিদ্ আর প্রফুল্লচন্দ্র ছিলেন রাসায়নিক—আবিষ্কারের ভেতর দিয়ে বিজ্ঞান-জগতে ভারতের আসন আবার সুপ্রতিষ্ঠিত হলো। স্বীকৃত হয় ভারতের বৈজ্ঞানিক প্রতিভা।

এই দুই বিজ্ঞান-সাধক এসে এদেশে বিজ্ঞানচর্চার যে স্বর্ণদ্বার খুলে দিলেন, সেই পথে অগ্রসর হয়ে পরবর্তিকালে শ্রীনিবাস, রামানুজম, চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রমন, মেঘনাদ সাহা, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, শিশিরকুমার মিত্র, কে. এল. কৃষ্ণণ, হোমি জাহাঙ্গীর ভাবা, বীরবল সাহানী প্রভৃতি প্রতিভাধর বিজ্ঞান-সাধকেরা তাঁদের নিজ নিজ গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক অবদানে বিজ্ঞান-জগতে ভারতের মুখ উজ্জ্বল করলেন। এঁদের মধ্যে রমন পদার্থবিজ্ঞানে দুর্লভ নোবেল পুরস্কার লাভ করেছিলেন। এঁদের মধ্যে আজ একজনের কথাই বলব। তিনি ডক্টর ভাবা। বিশ্বের শ্রেষ্ঠ পরমাণুবিজ্ঞানীদের তিনি যেমন অন্যতম ছিলেন তেমনি তিনিই আমাদের দেশে পরমাণু যুগের সূচনা করে গিয়েছেন। মহাজাগতিক রশ্মি ও পরমাণু-বিজ্ঞানসম্পর্কিত গবেষণায় তিনি আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করেছিলেন। তাঁর প্রতিভার স্বীকৃতি হিসাবে ইংলণ্ডের রয়্যাল সোসাইটি ভাবাকে সদস্য হিসাবে নির্বাচিত করেছিলেন আর ভারত সরকার তাঁকে পরমাণু-শক্তি কমিশনের প্রথম সভাপতি হিসাবে নিযুক্ত করেছিলেন। মুষ্টিমেয় যে কয়জনের অসাধারণ কর্মক্ষমতা ও সৃজনীশক্তির ফলে অগ্রগতির পথে মানবজাতির পদক্ষেপ সম্ভব হয়েছে, হোমি জাহাঙ্গীর ভাবা তাঁদেরই একজন।

স্বাধীনতা লাভের আগে ভারতবর্ষে বৈজ্ঞানিক গবেষণা খুব সামান্যই হয়েছে। বিজ্ঞানের অনুশীলনের প্রধান স্থান তখন ছিল কলকাতা আর ব্যাঙ্গালোর। কলকাতায় বিজ্ঞানচর্চার জন্য প্রথম যে

সংস্থাটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সেটির নাম ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট ফর কালটিভেসন অব সায়েন্স। এটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার। এইখানে গবেষণা করেই স্যর চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রমন পদার্থবিদ্যায় নোবেল প্রাইজ লাভ করেছিলেন। তারপর যখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজ স্থাপিত হয় তখন থেকে বিজ্ঞানচর্চার প্রসার ঘটে। বিজ্ঞান কলেজ যখন স্থাপিত হয় তখন আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু তাঁর নিজস্ব গবেষণাগার—বসু-বিজ্ঞান মন্দির (Bose Institute) স্থাপন করেন। এই তিনটি সংস্থা ভারতের চারিপ্রান্ত থেকে তরুণ বিজ্ঞান সাধকদের আকর্ষণ করেছিল—আজো করে থাকে। এরপরেই উল্লেখযোগ্য হলো ব্যাঙ্গালোরের ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স। এই প্রতিষ্ঠানটিও বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য তখন খ্যাতি লাভ করেছিল। এর প্রথম ভারতীয় ডিরেক্টর ছিলেন আচার্য রমন। হোমি জাহাঙ্গীর ভাবার কর্মজীবন এইখানেই শুরু হয়েছিল।

এগারো দিন ও এগারো রাত হলো ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করেছে। নবলব্ধ স্বাধীনতার ফল ভোগ করতে ভারতবাসী তখন আনন্দে মেতে উঠেছে। কিন্তু এই নতুন পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে যে দায়িত্ব, জাতির প্রতি যে কর্তব্য এসে গিয়েছিল সে-বিষয়ে ভারতবাসী সম্পূর্ণভাবে সচেতন ছিল না।

সে দিন ছিল ২৬ অগস্ট, ১৯৪৭।

পারমাণবিক শক্তি গবেষণা কমিটির চেয়ারম্যান হিসাবে সম্পূর্ণ আত্মবিশ্বাস নিয়ে ডক্টর হোমি ভাবা ভাষণ দিচ্ছিলেন। এটাই ছিল তাঁর প্রথম ভাষণ। তিনি বললেন—'আজ আমরা আমাদের ইতিহাসের একটা নতুন অধ্যায়ে এসে উপনীত হয়েছি। এই অধ্যায়টি গৌরবময় হবে—এমন আশা আমরা সবাই পোষণ করি। পারমাণবিক শক্তিকে কি করে মানুষের কাজে ব্যবহার করা যায়

—এই তথ্য আবিষ্কার হবার পর মানুষ যে অগ্রগতির পথে একটা বিরাট পদক্ষেপ করেছে, ইতিহাসের গতি একদিন তা প্রমাণ করবে। এই শক্তির উন্নতি ও ব্যবহার একটি জাতীয় প্রশ্ন। আগামী কয়েক বৎসর কালের জন্য এই বিষয়ে আমাদের নীতি এমন ভাবে নির্ধারিত করতে হবে যাতে করে এই কাজের উপযোগী যাঁরা আছেন তাঁদের সবাইকে এইখানে সমবেত করা যেতে পারে। এই উপায়েই আমরা উন্নত দেশগুলির পারমাণবিক গবেষণা কেন্দ্রগুলির তুল্য একটি কেন্দ্র শীঘ্রই স্থাপন করতে পারি।'

এই কথাগুলি থেকেই আমরা বুঝতে পারি ডক্টর ভাবা কি রকম দূরদৃষ্টিসম্পন্ন মানুষ ছিলেন। এইভাবেই ১৯৪৮ সালে পারমাণবিক শক্তি কমিশন সংগঠিত হয়েছিল এবং এর ফলেই এই ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের একটি নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছিল। এই কমিশনের সকল দায়িত্ব নিতে গিয়ে এই মানুষটি যে কি পরিমাণ স্বার্থত্যাগ করেছিলেন তাঁর এই জীবনচরিত থেকে তোমরা সেই কথা জানতে পারবে।

১৯৩০ সাল।

এই বছরে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলন আরো ব্যাপকভাবে সমগ্র দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। সেই সময়ে, হোমি জাহাঙ্গীর ভাবা নামে এক তরুণ যুবক, বয়স তাঁর বিশ বছর হবে, ইংলণ্ডে পড়াশুনা করছিলেন। তিনি ছিলেন বিজ্ঞানের ছাত্র এবং অশেষ পরিশ্রম সহকারে কঠিন পদার্থবিদ্যা আয়ত্ত করেছিলেন। চোখে তাঁর উজ্জ্বল স্বপ্ন আর হৃদয়ে বুকভরা আশা। পৃথিবীতে বিজ্ঞানের সাধনায় যাঁরা কীর্তিমান হয়েছেন, কেমব্রিজের এই ভারতীয় ছাত্রটি সর্বদা কেবল তাঁদের কথা চিন্তা করতেন। তাঁদেরই সারিতে একদিন তিনি স্থান করে নেবেন নিজের প্রতিভা আর পরিশ্রমের সাহায্যে—এই ছিল তাঁর স্বপ্ন, তাঁর আশা। কেমন করে তিনি তাঁর এই স্বপ্ন আর আশা চরিতার্থ করেছিলেন সেই কাহিনী খুবই চিত্তাকর্ষক।

১৯০৯। ৩০ অক্টোবর।

বোম্বাইয়ের এক সম্ভ্রান্ত ও ধনী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন এই বছরের এই দিনটিতে হোমি জাহাঙ্গীর ভাবা। বিজ্ঞানের ইতিহাসে এই সময়টা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সম্পর্কে পুরাতন কালের যত ধারণা সব তখন বদলে যেতে শুরু করেছে আইন-স্টাইনের যুগান্তকারী চিন্তার ফলে। আবার এই বছরটি ভারতবর্ষের শিল্পজাগরণের ইতিহাসেও অবিস্মরণীয় হয়ে আছে। এই বছরের মে মাসে বিহারে সাকচি নামক স্থানে (এখনকার নাম টাটানগর) ভারতের প্রথম ইস্পাত তৈরি কারখানার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়। বোম্বাইয়ের বিখ্যাত ব্যবসায়ী জামসেৎজী টাটার উদ্যোগেই এই অসম্ভব সম্ভব হয়েছিল। ভারতর্ষকে তিনিই প্রথম পৃথিবীর শিল্প মানচিত্রে স্থাপন করেছিলেন। জামসেৎজী টাটার নাম তাই আজো শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারিত হয়ে থাকে। এই টাটা পরিবারের সঙ্গে ভাবা পরিবারের ছিল নিকট আত্মীয়তা।

ভাবারা পুরুষানুক্রমে বিত্তশালী ও শিক্ষিত। ঠাকুর্দা ছিলেন মহীশূর রাজ্যের শিক্ষাবিভাগের অধিকর্তা। বাবা একজন অভিজ্ঞ আইন ব্যবসায়ী, তিনি টাটা প্রতিষ্ঠানসমূহের সঙ্গে আইনের পরামর্শদাতা হিসাবে দীর্ঘকাল সংযুক্ত ছিলেন। তীক্ষ্ণ বুদ্ধি আর মন নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন ভারতের পরমাণুবিজ্ঞানের ভবিষ্যৎ জনক। হোমির বয়স যখন পাঁচ বছর তখন তার ঠাকুর্দা তাকে কিছু দিনের জন্য মহীশূরে নিয়ে গিয়েছিলেন। প্রাথমিক লেখাপড়া তাঁর কাছেই হয়। অল্পদিন পরে তিনি বুঝতে পারলেন যে তাঁদের বংশে একটি অসাধারণ প্রতিভাবান ছেলে জন্মেছে। সেই কথা তিনি তাঁর পুত্রকে এক চিঠিতে জানিয়ে লিখেছিলেন—'এতটুকু বয়সের ছেলে হোমি, কিন্তু কী তার বুদ্ধি। বুদ্ধির দীপ্তি তো তার চোখেমুখেই দেখতে পাচ্ছি। আমার মন বলছে, এর থেকেই আমাদের বংশের—শুধু আমাদের বংশের নয়, আমাদের দেশের মুখ উজ্জ্বল হবে। তখন আমি

বেঁচে থাকব না। একে যেন খুব যত্নের সঙ্গে লালনপালন করা হয় আর এর শিক্ষার জন্য যেন কোন ত্রুটি না করা হয়।'

ভাবা পরিবারের মতো সমস্ত ভারতবাসী আজ জানে যে বৃদ্ধের এই ভবিষ্যদ্বাণী নিস্ফল হয়নি। ছেলেবেলায় হোমির ঘুম ছিল না বললেই হয়—খুব কম সময় সে ঘুমাতো। এজন্য তার বাবা ও মায়ের দুশ্চিন্তার অবধি ছিল না। বড় বড় ডাক্তারদের ডাকা হলো। কিন্তু তাঁদের কেউই রোগ নির্ণয় করতে পারলেন না। বাড়ির লোকের দুশ্চিন্তা আরো বাড়ে। এতটুকু বয়সের ছেলে, ঠিকমতো যদি না ঘুমোয় তাহলে শরীর দুর্বল হয়ে পড়বে। অবশেষে উদ্বিগ্ন পিতামাতা শিশুপুত্রকে এক সাহেব ডাক্তারের কাছে নিয়ে এলেন। তিনি তন্ন তন্ন করে পরীক্ষা করলেন এবং পরীক্ষার পর জানালেন যে শিশুর স্বাস্থ্য সম্পর্কে ভাববার কিছু নেই। তার স্বাস্থ্য চমৎকার।

—তবে ওর ঘুম এত কম কেন? জিজ্ঞাসা করেন উৎকণ্ঠিত পিতা।

—এই বয়সের ছেলেরা কত ঘুমোয়। বলেন উৎকণ্ঠিতা মা।

—কেন এত কম ঘুম জানেন? আপনাদের এই ছেলে জন্মেছে অত্যন্ত সক্রিয় মস্তিষ্ক নিয়ে—আমাদের চিকিৎসাবিদ্যায় যাকে বলে সুপার অ্যাকটিভ ব্রেন যার ভেতর দিয়ে অনবরত চিন্তার স্রোত প্রবাহিত হয়। আপনাদের এই ছেলের মাথাটা যেমন বড়ো, এর ভেতরের মস্তিষ্কটা তেমনি সক্রিয়। ঘুম এই কারণেই হয় না। তবে এজন্য ওর শারীরিক স্বাস্থ্যের কোন ক্ষতি হবার ভয় নেই।

পিতামাতা নিশ্চিন্ত হলেন।

ছেলেবেলাতে আরো কয়েকটা বৈশিষ্ট্য দেখা গিয়েছিল হোমির মধ্যে। গান শুনলেই কান খাড়া করতেন। কোথাও গানের আওয়াজ শুনতে পেয়েছে কি অমনি স্থির হয়ে সেটি শুনতো। ছেলেবেলা থেকেই ভারতীয় মার্গসংগীতের প্রতি তার ছিল প্রবল আকর্ষণ। একবার হোল কি, হোমি খুব কাঁদছিল। মা তাকে কত খেলনা দিয়ে ভোলাবার

চেষ্টা করলেন। তবু ছেলের কান্না থামে না। ঠিক সেই সময় ঘরের বাইরে কে যেন গানের রেকর্ড বাজালো। যে মুহূর্তে শিশুর কানে সেই গানের শব্দ এলো, অমনি তার কান্না থেমে যায় সে মন দিয়ে গান শুনতে থাকে। তখন থেকে হোমি কাঁদলেই গান বাজিয়ে তাকে চুপ করানো হতো।

শৈশবে হোমির মধ্যে আর একটা আশ্চর্য গুণ দেখা গিয়েছিল। সে খুব সুন্দর ছবি আঁকতে পারত আর ড্রয়িং করতে পারত। কেউ তাকে শেখায়নি—নিজের চেষ্টাতেই সে এসব পারত। সবাই দেখে অবাক হতো। প্রকৃতিপ্রেমিক এই ছেলেটির আঁকা ছবিতে মৌলিকতার ছাপ ছিল খুব সুস্পষ্ট। ছবিগুলিও দেখতে সুন্দর ও আকর্ষণীয় হতো।

বিজ্ঞানের প্রতি হোমির আশৈশব অনুরাগ ছিল সত্য—কিন্তু তিনি সংসারের একজনকেই ভালবাসতেন—তাঁর মা-কে। তাঁর নিজের হাতে আঁকা তাঁর মায়ের ছবিটি এর জলজ্যান্ত প্রমাণ—তাঁর শিল্প-প্রতিভারও একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন এই ছবিটি, একথা সবাই বলে থাকেন। তাই অনেকের মতে ভাবা যদি বিজ্ঞানের বদলে চারুশিল্পের দিকে যেতেন তাহলে তিনি একজন শ্রেষ্ঠ শিল্পী হিসাবে স্বীকৃত হতে পারতেন। তাঁর মধ্যে সে প্রতিভা ছিল।

ভারতীয় অথবা বিদেশী কোন খেলাধূলাতেই হোমির তেমন আকর্ষণ ছিল না। তবে একটা খেলাতে তার আকর্ষণ ছিল—মেক্কানো[১]। ঘণ্টার পর ঘণ্টা সে এই নিয়ে থাকত, কারণ এই খেলায় বুদ্ধির দরকার হতো। এর ফলে অনেকক্ষণ ধরে কোন একটা বিষয়ে মনঃসংযোগ করবার বৃত্তিটা ভালভাবেই বিকশিত হয়ে উঠেছিল ঐ বয়সে। 'আমি যে কোন একটা কাজে এত বেশি মন দিতে পারতাম—এই অভ্যাসটা আমি ছেলেবেলায় মেক্কানো খেলতে খেলতে শিখেছি।'—এই কথা ভাবা বলতেন।

---

১ Meccano—এই খেলা অনেকটা দাবা খেলার মতো। এই খেলায় বুদ্ধির খুব দরকার হয়। এর উদ্ভব আরবদেশে।

ভাবার পিতামাতা দু'জনেই শিক্ষিত ছিলেন। তাঁরা তাঁদের পুত্রের জন্য সব সময়েই একটা অনুকূল পরিবেশ তৈরি করার চেষ্টা করতেন। সুন্দর পরিবেশের মধ্যেই মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি সুন্দরভাবে বিকশিত হয়ে ওঠে—এই সত্যটি তাঁরা বিশ্বাস করতেন। ছেলের স্কুল যাবার বয়স হলে তাকে প্রথমে একটি মিশনারি স্কুলে—ক্যাথিড্রাল হাইস্কুল—পাঠান হয়। মিশনারিদের স্কুলে ছেলেরা আদব-কায়দা শেখে, ভাল পড়াশুনা হয়, চরিত্রের বনিয়াদ দৃঢ় হয়। ক্যাথিড্রাল স্কুলে দু'বছর পড়ার পর ভাবাকে জন কনোন নামে আর একটি মিশনারি স্কুলে ভর্তি করে দেওয়া হয়। এই দুই স্কুলেই তাঁর ছাত্রজীবন খুবই দেদীপ্যমান ছিল—অনেকগুলি প্রাইজ পেয়েছিলেন—পেয়েছিলেন অনেক মেডেল। বলতে গেলে পুরস্কার আর পারিতোষিকের ভেতর দিয়েই ডক্টর ভাবার সমস্ত ছাত্রজীবনটা অতিবাহিত হয়েছিল।

স্কুলে প্রত্যেকটি ক্লাসে প্রাইজ পেয়েছিলেন—কত রকমের প্রাইজ ছিল সে সব—পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করার জন্য প্রাইজ, একটি দিনের জন্য স্কুলে অনুপস্থিত না থাকার দরুণ প্রাইজ, সুন্দর হাতের লেখার জন্য প্রাইজ, সুন্দর স্বভাবের জন্য প্রাইজ—এমনি নানা ধরনের বহু পুরস্কার লাভ করে স্কুল জীবনেই তিনি খ্যাতিমান হয়ে উঠেছিলেন এবং স্কুলের সেরা ছাত্র বলে গণ্য হয়েছিলেন। এমন পুত্র রত্নের জন্য ভাবা-দম্পতি আনন্দ বোধ করতেন। তাইতো তাঁরা বাড়িতে ছেলের জন্য একটি মনোরম পরিবেশ রচনা করে দিয়েছিলেন যা বালকের স্বাভাবিক বুদ্ধিবৃত্তি ও চরিত্র বিকাশের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় ছিল।

হোমির বাবা ও মা দু'জনেই লক্ষ্য করেছিলেন যে তাঁদের ছেলের স্বাভাবিক প্রবণতা বিজ্ঞানের দিকে এবং এর থেকেই তাঁদের দু'জনের মনেই ধারণা হয়েছিল যে, বড় হলে এ নিশ্চয়ই একজন বড়দরের বিজ্ঞানী হবে। তাঁদের এই ধারণা আশ্চর্যভাবেই সফল হয়েছিল। বিজ্ঞানের প্রতি ছেলের আগ্রহ যাতে বৃদ্ধি পায় সেজন্য তাঁরা বাড়িতেই একটা লাইব্রেরি করে দিয়েছিলেন—সেই লাইব্রেরিটি শুধু বিজ্ঞান

আর কারিগরি বিদ্যা-সম্পর্কিত বইতে পূর্ণ ছিল। হোমি বুঝতে পারে এমন সব সহজ বই-ই তাঁরা কিনে দিতেন। সে সব বইয়ের ষোল আনা সদ্ব্যবহার তিনি করেছিলেন। শুধু পড়া নয়—কোন কোন বিষয় নিয়ে কিশোর ভাবা হাতে-কলমে পরীক্ষাও করতেন। বইয়ের জগতেই তিনি বাস করতেন। কারো সঙ্গে মেলামেশা নয়, বা বাজে গল্প করা নয়—শুধু বই আর বই। পিথাগোরাস, ইউক্লিড, গ্যালিলিও, নিউটন প্রভৃতি বিজ্ঞানীদের জীবনী পাঠ করে তিনি কল্পনা করতেন যে, বড় হয়ে তিনিও তাঁদের মতো বিজ্ঞানী হবেন। এই ভাবেই তাঁর বৈজ্ঞানিক জীবনের বনিয়াদ তৈরি হয়েছিল—ভালভাবেই তৈরি হয়েছিল।

এইভাবে পনর বছর বয়সে বিজ্ঞান জগতের অনেক কিছুই তাঁর জানা হয়ে গিয়েছিল একমাত্র নিজের চেষ্টায়। হোমির সহপাঠীরা দেখে অবাক হতেন, অবাক হতেন তাঁর শিক্ষকগণ। তখন আইন-স্টাইনের নাম বা তাঁর আপেক্ষিক তত্ত্বের কথা খুব কম লোকেই জানত। কিন্তু ভাবার কাছে আইনস্টাইনের কঠিন তত্ত্বটা একটা গল্পের মতো কি রকম সহজ মনে হতো, সেই কাহিনী বইয়ের গোড়াতেই বলা হয়েছে।

॥ তিন ॥

পনর বছর বয়সে ভাবা সিনিয়র কেমব্রিজ পরীক্ষা পাশ করলেন কৃতিত্বের সঙ্গে। উত্তীর্ণ ছাত্রদের মধ্যে প্রথম তো হয়েই ছিলেন, এমন কি প্রত্যেকটি বিষয়েও তাঁরই ছিল প্রথম স্থান। তখন তাঁকে এলফিনস্টোন কলেজে ভর্তি করে দেওয়া হলো। বোম্বাই শহরের সেরা কলেজ এটি। এখানে ভাল ভাল ছাত্ররাই পড়তে আসত। এখানে কিছুদিন পড়ার পর ভাবা ভর্তি হলেন বোম্বাইয়ের রয়্যাল ইনস্টিটিউট অব সায়েন্সে। বাবার ইচ্ছা ছিল ছেলে এঞ্জিনীয়ার হয়, সেইজন্য তাঁকে এখানে ভর্তি করে দেওয়া হয়। তখনো তাঁর বয়স কুড়ি বছর হয়নি।

তিনি যখন ইনস্টিটিউটের ছাত্র তখন একদিন ছাত্রদের এক বিতর্ক সভায় 'সমাজ কল্যাণে বিজ্ঞানের দান'—এই বিষয়ে তাঁকে বক্তৃতা করতে বলা হয়। অধ্যক্ষ ও অধ্যাপকদের মধ্যে কয়েকজন সেখানে উপস্থিত ছিলেন। উনিশ বছরের একজন ছাত্র এমন একটি কঠিন বিষয় সম্পর্কে এমন সুন্দর বক্তৃতা করলেন যা শুনে সকলেই যারপর নাই বিস্মিত হয়েছিলেন। ভাবার ছাত্রজীবনের এই বক্তৃতাটি ইনস্টিটিউটের ম্যাগাজিনে ছাপা হয়েছিল। এর থেকে কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত হলো—

'আমরা এখন বিজ্ঞানের যুগে বাস করছি। বিজ্ঞানের বলে মানুষ প্রকৃতির অনেক রহস্য জানতে পেরেছে এবং প্রকৃতিকে সে তার বশে এনেছে। বিজ্ঞানের দৌলতে মানুষ বিপুল শক্তির অধিকারী হয়েছে। এই শক্তিকে ধ্বংসের কাজে প্রয়োগ না করে সমাজের কল্যাণে প্রয়োগ করতে পারলেই বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য সার্থক হবে। আদিম মানুষ যখন অসহায় ভাবে প্রকৃতির প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যে জীবনযাপন করত তখন তার হাতে বিজ্ঞানের কোন অস্ত্র ছিল না। যেদিন থেকে মানুষ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে পদক্ষেপ করল সেদিন থেকে শুরু হয় তার জয়যাত্রা, সেদিন থেকেই শুরু হয় মানবসভ্যতার অবাধ অগ্রগতি। আমাদের সমাজকে সকল দিকে দিয়ে সুন্দর করে গড়ে তুলতে হলে বিজ্ঞানের সত্যকে নিষ্ঠার সঙ্গে ব্যবহার করতে হবে।'

আর একদিন ক্লাসে তাঁর এক সহপাঠীকে একটা ডিটেকটিভ বই পড়তে দেখে ভাবা তাকে বলেছিলেন এসব বই পড় কেন ?

—ডিটেকটিভ গল্পের মধ্যে উত্তেজনার খোরাক থাকে। বিজ্ঞানের মধ্যে কি এসব আছে ?

—কিন্তু বিজ্ঞানের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ডিটেকটিভ গল্প কি আর কিছু আছে ? বিজ্ঞানের চেয়ে উত্তেজক আর কিছু হতে পারে না। বিজ্ঞানে মাথা খোলে, বিজ্ঞানে বুদ্ধি বাড়ে। তোমাদের ডিটেকটিভ গল্পের যিনি রাজা সেই আর্থার কোনান ডয়েলই বলেছেন—'Science is the greatest detective story of all.'

সবাই শুনে অবাক হয়।

সবাই ভাবে তাদের এই সহপাঠী বড় হয়ে নিশ্চয়ই একজন বড় বিজ্ঞানী হবে। এই বয়সে বিজ্ঞানের প্রতি যার এমন আগ্রহ সে বিজ্ঞানী না হয়েই যায় না।

ইনস্টিটিউটে দু'বছর পড়া শেষ হলে উচ্চ শিক্ষালাভের জন্য ভাবাকে বিলেত পাঠান হলো। সেখানে তাঁকে কেমব্রিজ

বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি করে দেওয়া হয়। যদিও তাঁর নিজের আগ্রহ ছিল বিজ্ঞানে, তবু বাবার ইচ্ছায় তাঁকে পড়তে হয় এঞ্জিনীয়ারিং।

—তোমাকে এঞ্জিনীয়ারিং পড়তে হবে।

—আমি ভেবেছিলাম পদার্থ বিজ্ঞান ও গণিত নিয়ে কেমব্রিজে পড়ব। আপনি তো জানেন আমার কি রকম আগ্রহ এই দিকে।

—কিন্তু এঞ্জিনীয়ারিং পাশ করতে পারলেই টাটার বিরাট শিল্প সংস্থায় মোটা মাইনের একটা চাকরি অবধারিত।

প্রফেসারিও তো করতে পারি কোন কলেজে ?

—প্রফেসারি করে যা মাইনে পাবে তার চারগুণ মাইনে পাবে যদি তুমি এঞ্জিনীয়ার হতে পারো।

—বিজ্ঞানের লাইনে গেলে, গণিতের লাইনে আমি গবেষণার সুযোগ পাব। আমার জীবনের বড় আকাঙ্ক্ষা আমি একজন বিজ্ঞানী হব—স্যর জে. সি. বোস, স্যর পি. সি. রায়, স্যর সি. ভি. রমন—এঁদের জীবনই আমার আদর্শ।

—কিন্তু আমার ইচ্ছা তুমি একজন এঞ্জিনীয়ার হও। টাটার এঞ্জিনীয়ার হতে পারলে সম্মান ও অর্থ দুই-ই পাবে তুমি।

শেষ পর্যন্ত নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও পুত্রকে মেনে নিতে হয় পিতার মত। মেনে নিতে হয় তাঁর আত্মীয় স্বজনদের ইচ্ছা। এঞ্জিনীয়ারিং পড়তেই ভাবা বিলেত গেলেন। এঞ্জিনীয়ারিং পড়তে তিনি বিলেত এলেন বটে, কিন্তু বিজ্ঞানলক্ষ্মী ভাবাকে যেন হাতছানি দিয়ে ডাকলেন। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি কেমব্রিজের প্রতিভাবান ছাত্রদের অন্যতম হয়ে উঠলেন। ইংরেজ অধ্যাপকরা পর্যন্ত এই তরুণ ভারতীয় ছাত্রটির প্রতিভায় মুগ্ধ হলেন। ১৯৩০ সালে তিনি এঞ্জিনীয়ারিং ট্রাইপস পরীক্ষার কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হন। তখন ভাবার বয়স মাত্র একুশ বছর ছিল।

এখানে তিনি অনেকগুলি স্কলারসিপ লাভ করেছিলেন। এক সঙ্গে পাঁচটি বিষয় নিয়ে পাশ করে ভাবা কেমব্রিজে রেকর্ড সৃষ্টি করে

ছিলেন। এতগুলি বিষয় তাঁর কাছে কখনই বেশি বলে মনে হতো না। তিনি সেগুলি অবলীলাক্রমেই পড়ে শেষ করেছিলেন। যদিও নিরলস অধ্যয়নের দ্বারা তাঁর কেমব্রিজের দিনগুলি চিহ্নিত হয়ে আছে, তথাপি তিনি যে একজন গ্রন্থকীট ছিলেন তা নয়। আগেই বলেছি গানে ও ছবি আঁকায় ভাবার প্রবল ঝোঁক ছিল। বিলেতে ছাত্র হিসাবে আসার পর তাঁর এই আগ্রহ সমানভাবেই ছিল। এঞ্জিনীয়ারিং পড়তে গেলে কত বই পড়তে হয়, তার ওপর তিনি নিয়েছিলেন একসঙ্গে পাঁচটা বিষয়—এক-একটা বিষয়ের জন্য তিন-চারখানা করে বই পড়তে হতো।

আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এই বিপুল পরিমাণ অধ্যয়নের চাপে শিল্প বা সংগীতের প্রতি ভাবার আগ্রহ কিছুমাত্র কমেনি। তিনি নিয়মিতভাবে গানের আসরে উপস্থিত থাকতেন ; সময় পেলেই ছবি আঁকতেন। ইংলণ্ডের একাধিক চিত্রশালায় ভাবার আঁকা ছবি আজো শোভা পাচ্ছে। ইংলণ্ডে ছাত্রজীবনেই ভাবার রাজনৈতিক মতবাদ গঠিত হয়েছিল। আধুনিক কালের মানুষের পক্ষে রাজনীতির বাইরে থাকা সম্ভব নয়, সঙ্গত নয় ; রাজনৈতিক চিন্তাহীন মানুষ এ যুগের সমাজে অচল—এই রকম ধারণা যে তরুণ হোমির মনে সেদিন জেগেছিল এমন অনুমান আমরা অনায়াসেই করতে পারি। তাই কলেজের পাঠ্য পুস্তকের সঙ্গে রাজনীতি সম্পর্কিত বাছাই করা অনেক বই তিনি যত্নের সঙ্গে নিজে নিজেই পড়েছিলেন। শুধু তাঁর একজন অধ্যাপক তাঁকে বইয়ের একটি তালিকা ঠিক করে দিয়েছিলেন।

এইভাবে পড়াশুনা করার ফলে তাঁর মনের মধ্যে রাজনৈতিক চিন্তা এসে দানা বাঁধতে থাকে এবং তিনি ইংলণ্ডের সোসালিস্ট বা সমাজতন্ত্রী দলে নাম লেখালেন এবং এর সভ্যশ্রেণীভুক্ত হলেন। কালক্রমে তাঁর রাজনৈতিক চিন্তার পরিধি বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং ব্যষ্টি ও সমষ্টির মধ্যে তাঁর মনে এই ধারণা জন্মালো যে, ব্যষ্টিই মুখ্য, সমষ্টি গৌণ ; সমাজ অপেক্ষা ব্যক্তি-মানুষেরই মূল্য বেশি।

পরবর্তিকালে অবশ্য পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর সংস্পর্শে আসার পর ভাবা প্রধান মন্ত্রীর মানবিক আদর্শ দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন।

কিন্তু ইংলণ্ডে এসে বিজ্ঞান সম্পর্কে ভাবার বহুমুখী আগ্রহ চরিতার্থ হওয়ার সুযোগ এসেছিল। কলেজের গ্রন্থাগারে য়ুরোপ ও আমেরিকার যাবতীয় বৈজ্ঞানিক পত্র-পত্রিকা পড়বার অবাধ সুযোগ তিনি পেয়েছিলেন এবং মনের আনন্দে তিনি যেন সেগুলি গো-গ্রাসে গিলতেন। অধ্যয়ন ছিল তাঁর লক্ষ্য আর এই লক্ষ্যে তরুণ ভাবা ছিলেন একলব্যের মতোই একনিষ্ঠ। অধ্যয়নে এই একাগ্রচিত্ত নিষ্ঠার ফলে তিনি বহুবিধ পুরস্কার লাভ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁর সহপাঠীরা বিস্ময়ের সঙ্গে দেখতেন কেমন অবলীলাক্রমে তিনি একটির পর একটি প্রাইজ করায়ত্ত করেছিলেন। একদিন ভাবাকে ফিলজফিক্যাল ম্যাগাজিন পড়তে দেখে তাঁর এক সহপাঠী তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, বিজ্ঞানের যতগুলি পত্রিকা আছে, শুনেছি সেগুলির মধ্যে এটিই সবচেয়ে কঠিন। আমরা তো স্নাতক শ্রেণীর ছাত্র, এই পত্রিকা পড়ার যোগ্যতা কি আমরা অর্জন করেছি ?

—স্যর আইজাক নিউটনের জীবনী পড়েছ ?

—না।

—তাই এই রকম প্রশ্ন করছ। এই কেমব্রিজেরই তিনি একজন ছাত্র ছিলেন। এখানে তাঁর তৈলচিত্র ও আবক্ষ মর্মর মূর্তি রাখা আছে, দেখেছ নিশ্চয়ই। আঠার বছর বয়সে যখন তিনি এখানে আসেন তখনই তাঁর জ্ঞানের বহর দেখে তাঁকে ট্রিনিটি কলেজে ভর্তি করে নেওয়া হয়েছিল। তাঁর গণিতের অধ্যাপক বুঝতে পেরেছিলেন যে, এই ছাত্রটি সাধারণ থেকে আলাদা আর গণিতে তার অসাধারণ আগ্রহ। জানো নিউটনের বয়স যখন মাত্র ছাব্বিশ বছর তখন তিনি গণিতের অধ্যাপক হয়েছিলেন এবং ত্রিশ বছর বয়সেই তিনি একজন বিজ্ঞানী হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। আইনস্টাইন ছাব্বিশ বছর বয়সে তাঁর যুগান্তকারী তত্ত্ব আবিষ্কার করেছিলেন জানো ?

—কিন্তু আমার আসল প্রশ্নটা তুমি এড়িয়ে যাচ্ছ।

—না, এড়িয়ে যাব কেন? এই তু'জন মহাবিজ্ঞানীর দৃষ্টান্ত উল্লেখ করলাম এইজন্য যে জ্ঞান অর্জনের জন্য কোন বয়স নেই। আমরা যদি চেষ্টা করি তাহলে ফিলজফিক্যাল ম্যাগাজিন পড়ে বুঝতে পারব না কেন?

তাঁর সহপাঠীরা এই কথা শুনবার পর ভাবাকে নিয়ে পরিহাস করতে আর সাহস পেত না। তারা সকলেই এই অসাধারণ ছাত্রটিকে সমীহ করত। এইজন্যই তো তিনি কেমব্রিজের প্রতিভাবান ছাত্র হিসাবে গণ্য হয়েছিলেন। ১৯৩০ সালে বলবিদ্যা বিজ্ঞানে (Mechanical Science) অর্থাৎ এঞ্জিনীয়ারিং-এ যখন তিনি স্নাতক হলেন, তখন বোম্বাইতে এই সংবাদে তাঁর বাড়ির সকলেই, বিশেষ করে তাঁর বাবা খুব আনন্দিত হলেন। টাটার ইস্পাত তৈরির কারখানায় তু'হাজার টাকা মাইনের একটা চাকরি ভাবার জন্য অবধারিত ছিল। তাই হোমির বাবা ছেলেকে সত্বর দেশে ফিরতে নির্দেশ দিলেন। হোমি তাঁর বাবাকে এক চিঠিতে জানালেন—'আমাকে তু'বছরের জন্য অঙ্কেতে একটা স্কলারসিপ দেওয়া হয়েছে[১] আমি তাই এখন দেশে ফিরতে পারব না।' কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সেরা ছাত্ররাই এই বৃত্তি লাভ করতেন। ভাবার আগে আর কোন ভারতীয় ছাত্র এই বৃত্তি লাভ করেন নি।

আসল কথা এঞ্জিনীয়ারিং লাইনটা ভাবার ঠিক মনঃপূত ছিল না। এই বৃত্তি পাওয়ার পর তিনি কিছুকাল জুরিখে গিয়ে উলফ গাং পাউলির অধীনে গবেষণা করেন এবং পরে রোমে এনরিকো ফের্মির অধীনে গবেষণা করেন। এই বৃত্তির মেয়াদ শেষ হলে পরে, ১৯৩৩ সালে ভাবাকে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ আর একটি বৃত্তি প্রদান করেন—স্যর আইজাক নিউটন স্টুডেণ্টসিপ। খুব প্রতিভাবান

১. Rouse Ball travelling studentship in Mathematics-এর পরিমাণ ছিল মাসিক পঞ্চাশ পাউণ্ড।

ছাত্র ভিন্ন এই দুর্লভ বৃত্তি সচরাচর কোন ছাত্র লাভ করতে পারত না। যে কোন ছাত্রের পক্ষেই এই বৃত্তি পাওয়া গৌরবের বিষয় বলে গণ্য হতো। এর আগে কেমব্রিজে আর কোন ভারতীয় ছাত্র এই বৃত্তি লাভ করেন নি। বোম্বাইতে তাঁদের বাড়িতে যখন এই সংবাদ পৌঁছল তখন হোমির মা ও বাবা দু'জনেই খুশি হলেন। মায়ের আনন্দের মাত্রাটা যেন একটু বেশি ছিল। তিনি তাঁর স্বামীকে বললেন, ছাখো, তুমি তো এঞ্জিনীয়ারিং পাশ করার সঙ্গে সঙ্গে ছেলেকে দেশে ফিরে আসতে বলেছিলে, কিন্তু এখন বুঝতে পারছ হোমি এঞ্জিনীয়ার হবার জন্য জন্মায়নি।

হোমির বাবা উত্তরে কিছু বললেন না। তিনিও মনে মনে হয়ত চিন্তা করে থাকবেন যে, তাঁর ছেলে টাটা কোম্পানীতে চাকরি করবার জন্য জন্মায়নি—তার জন্য হয়ত সত্যিই একটা বিরাট ভবিষ্যৎ প্রতীক্ষা করছে। এই সময়ে একদিন বিলেত থেকে চিঠি এলো। হোমি তাঁর বাবাকে লিখেছেন—'বাবা, আপনারা হয়ত খবরের কাগজে দেখে থাকবেন যে, কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ আমাকে আর একটা উঁচুদরের বৃত্তি প্রদান করেছেন। নিউটন স্টুডেন্টসিপ পাওয়ার পর আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে যে 'থিসিস' (Thesis-গবেষণামূলক প্রবন্ধ) দাখিল করেছিলাম তার জন্য আমাকে 'পি. এইচ. ডি' উপাধি দেওয়া হয়েছে, আর সেই সঙ্গে দেওয়া হয়েছে আর একটা বৃত্তি। এর নাম '1851 Exhibition Studentship'. একশো বছর আগে এটি প্রবর্তিত হয়েছিল। আমাকে তাই আরো দু'বছরের জন্য এই দেশে থেকে যেতে হবে। আমি এখন বুঝতে পারছি আমার জীবন বিধাতা আমার জন্য বৈজ্ঞানিক গবেষণার পথ ঠিক করে রেখেছেন। প্রথমবার রাউজ বল ট্র্যাভেলিং স্টুডেন্টসিপ পেয়ে আমি জুরিখ ও রোমে গিয়ে যাঁদের অধীনে গবেষণা করবার সুযোগ পেয়েছিলাম তাঁরা এদেশের পদার্থ বিজ্ঞানীদের শীর্ষস্থানীয়। আমি গাণিতিক পদার্থবিদ্যা নিয়ে কাজ করি—এই তাঁদের ইচ্ছা।'

তাঁদের সেই হোমি এখন 'ডক্টর হোমি জাহাঙ্গীর ভাবা', এই সংবাদে বাবা ও মা এবং আত্মীয়-স্বজন সকলেই যার পর নাই খুশি হলেন। খুশি হলেন তাঁর এখানকার স্কুল ও কলেজের শিক্ষক ও অধ্যাপকবৃন্দ। এইভাবেই সেদিন ভাবার নামটি ভারতবর্ষের বিদগ্ধমহলে ছড়িয়ে পড়েছিল। সকলেই যেন সাগ্রহে ভারতীয় বিজ্ঞান জগতের দিগন্তে এক নব জ্যোতিষ্কের আবির্ভাবের জন্য সাগ্রহে অপেক্ষা করতে লাগলেন। ইংলণ্ডের ছাত্র মহলেও 'হোমি ভাবা' এই নামটি তখন বেশ সুপরিচিত হয়ে উঠেছিল।

এখানে উল্লেখ করা দরকার যে, যদিও প্রধানত তিনি ইংলণ্ডে এসেছিলেন এঞ্জিনীয়ারিং পড়তে কিন্তু শিক্ষাকালে নতুন কোয়াণ্টাম তত্ত্বে গবেষণারত প্রখ্যাত গাণিতিক পদার্থবিদদের সংস্পর্শে এসে ভাবার মনে প্রকৃতির পদার্থগত সমস্যাসমূহের গভীরে প্রবেশ করবার আগ্রহ বিশেষভাবে জাগ্রত হয়। এর ফলে শীঘ্রই তিনি এঞ্জিনীয়ারিং ছেড়ে গাণিতিক পদার্থবিদ্যায় মনোনিবেশ করেন এবং কেমব্রিজের গনাভিলি ও কেয়াস কলেজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হন। পদার্থবিদ্যার যে বিষয়টি ভাবার মনে প্রথমে আগ্রহের সৃষ্টি করে সেটি হচ্ছে দ্রুতগামী পজিট্রনের বিনাশ সম্পর্কে গবেষণা। প্রথমবার বৃত্তি পেয়ে অধ্যাপক ফের্মির অধীনে রোমে ইনষ্টিটিউট অব ফিজিক্স-এ তিনি এই বিষয়ে গবেষণা করেন। ১৯৩৬ সালে এগজিবিশন বৃত্তি লাভ করে, ডক্টর ভাবা কোপেনহেগেনের বোর ইনষ্টিটিউটে[১], কিছুকাল অতিবাহিত

১ নীলস্ বোর (Niels Bohr) (১৮৮৫-১৯৬৫) পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ পরমাণু বিজ্ঞানী। পরমাণুর গঠন সম্পর্কে তিনি বিশদভাবে গবেষণা করেন এবং বিশ্লেষণ করে এর রহস্য উদঘাটন করেন। কোপেনহেগেন ইনষ্টিটিউট অব ফিজিক্স-এর তিনি প্রধান পরিচালক ছিলেন ; এই ইনষ্টিটিউট এখন তাঁর নামে পরিচিত। ১৯১২ সালে তিনি পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। এঁর সম্পর্কে আইনস্টাইন বলতেন—'নীলস্ বোর ভিন্ন পরমাণু (atom) সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান-অসম্পূর্ণ থেকে যেত।' ভাবা এঁরই অধীনে কোপেনহেগেনে কাজ করার দুর্লভ সুযোগ লাভ করেছিলেন।

করেন। এখানে থাকাকালে অধ্যাপক ডাবলিউ হাইটলারের সহযোগে তিনি একটি নতুন তত্ত্বের সূচনা করেন এবং এটাই ছিল ভাবার বৈজ্ঞানিক প্রতিভার প্রথম স্ফুরণ।

এই তত্ত্বটির নাম 'Cascade Theory of cosmic ray shower' এবং এই তত্ত্বটি পরবর্তিকালে য়ুরোপের বিজ্ঞানী সমাজে এই তরুণ ভারতীয় বিজ্ঞানীকে সুপরিচিত করে তুলেছিল। বিষয়টি সংক্ষেপে বলি এখানে। 'কসমিক রে'-কে বলা হয় মহাজাগতিক রশ্মি। মহাশূন্য থেকে খুব সূক্ষ্ম মৌলিক কণিকা, বিশেষ করে তড়িতাবিষ্ট কণিকাসমূহ বায়ুমণ্ডল ভেদ করে এসে আমাদের এই পৃথিবীপৃষ্ঠে সব সময় বর্ষিত হচ্ছে। এই তড়িৎ-কণিকার অজস্র ধারা আসছে অতি সূক্ষ্ম তরঙ্গের আকারে আর তা অদৃশ্য আলোকরশ্মির মতো মহাশূন্যে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করবার সময় এদের সংগঠক নিউট্রন, প্রোটন প্রভৃতি বিভিন্ন কণিকার পরস্পর সংঘাতে এক রকম নতুন কণিকার সৃষ্টি হয়। ভাবা এই ভারী পদার্থ কণিকার নাম দেন 'মেসন' (Meson)[১]। ভূ-পৃষ্ঠে যে মহাজাগতিক রশ্মি পৌঁছায় তার প্রায় তিন-চতুর্থাংশই এই মেসন-কণিকা। জগতের সৃষ্টি রহস্যের মূলে এই অদৃশ্য রশ্মির প্রভাব কতখানি তা বিশেষ গবেষণার বিষয়। মহাজাগতিক রশ্মির বর্ধন সম্বন্ধে প্রপাততত্ত্বের (Cascade Theory) সূত্রপাত করা নিঃসন্দেহে ভাবার ছাত্রজীবনের একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ছিল। নীলস্ বোর, ম্যাক্স বোর্ন, ফের্মি ও ডিরাক প্রভৃতি বিশ্ববিশ্রুত বিজ্ঞানীদের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসাও তাঁর ছাত্রজীবনে কম গৌরবের বিষয় ছিল না। এইভাবেই হোমি ভাবা কেমব্রিজে থাকাকালে তত্ত্বীয় পদার্থবিদ্যার দিকে আকৃষ্ট হয়েছিলেন এবং এটা তাঁর জীবনে

১ মেসন-মহাজাগতিক রশ্মিতে পাওয়া এক রকম খুব সূক্ষ্ম কণিকা। মহাজাগতিক রশ্মির সঙ্গে এই মেসন কণিকা মহাশূন্য থেকে অজস্র ধারায় সর্বক্ষণ ভূ-পৃষ্ঠে বর্ষিত হয়ে থাকে।

যেমন, ভারতের পক্ষেও তেমনি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এই মৌলিক গবেষণার জন্য ১৯৩৭ সালে ভাবা অ্যাডাম্‌স পুরস্কার লাভ করেন। ভারতীয় ছাত্রদের মধ্যে তিনিই প্রথম এই সম্মানিত পুরস্কার লাভ করেছিলেন।

ইংলণ্ডের জ্ঞান-গরিমায় বিভূষিত হয়ে প্রায় দশ বছর পরে ডক্টর হোমি ভাবা স্বদেশে ফিরলেন। এখানে তাঁর জন্য গৌরবোজ্জ্বল ভবিষ্যৎ অপেক্ষা করছিল। তখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের দ্বিতীয় বৎসর চলছে।

॥ চার ॥

'সারাজীবন আমি বিজ্ঞানের সাধনায় নিযুক্ত থাকব, বিজ্ঞানকে দেশের বৈষয়িক উন্নয়নে নিয়োজিত করব। বিজ্ঞানকেই আমি জীবনের সঙ্গী করব।' বিলেত থেকে ভারতবর্ষে অল্পদিন আগে হোমি তাঁর এক বন্ধুকে একটি চিঠিতে এই কথাগুলি লিখেছিলেন।

তোমরা শুনে অবাক হবে, এ তাঁর কথার কথা ছিল না অথবা নিছক মনের আবেগে তিনি এই কথা লেখেননি। যা বলেছিলেন, কাজে তা-ই তিনি করেছিলেন। বিজ্ঞানকেই তিনি তাঁর জীবনের একমাত্র সঙ্গী করেছিলেন—গ্রহণ করেননি জীবনসঙ্গিনী। দেশে ফিরবার পর হোমির মা যখন ছেলের কাছে বিয়ের কথাটা তুললেন (একটি সুন্দরী ও শিক্ষিতা পাত্রী তিনি আগে থেকেই পছন্দ করে রেখেছিলেন) তখন ডক্টর ভাবা তাঁর মা-কে বললেন, আমার বিয়ে হয়ে গেছে মা।

—বলিস কিরে? কবে বিয়ে হলো? কাকে বিয়ে করলি আমরা কেউ কিছুই জানতে পারলাম না। তোর বাবা একথা শুনেছেন?

—না মা। আমি কাউকে জানাইনি এই বিয়ের কথা।

—মেম বিয়ে করেছিস ? কোথায় তোর বউ ?

—বউকে সঙ্গে করেই এনেছি।

—তাকে এনে কোথায় রেখেছিস ? কই, এতদিন তো কিছু বলিস নি।

মা ও ছেলেতে এই রকম কথাবার্তা হচ্ছে, এমন সময় সেখানে অতর্কিতে এসে উপস্থিত হলেন মিস্টার ভাবা—হোমির বাবা। অন্তরাল থেকে তাঁর স্ত্রীর শেষ কথাটা তাঁর কানে এসেছিল। সেই কথাটার জের টেনেই তিনি স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করেন, কার কথা হচ্ছে ?

—তোমার পুত্রবধূর কথা। শুনেছ হোমি বিলেতের একটা মেয়েকে বিয়ে করেছে আর তাকে সঙ্গে করেই এনেছে। এদিকে আমি তোমার বন্ধু ফিরোজ গান্ধীর মেজ মেয়েকে হোমির জন্য পছন্দ করে রেখেছি।

—আমি ভুল শুনছি না তো ? হোমি বিয়ে করেছে ? না—না, এ কখনই হতে পারে না।

—ছেলে তো সামনেই দাঁড়িয়ে রয়েছে। ওকেই তুমি জিজ্ঞাসা কর না। তাই তো বলি বিলেতে গিয়ে লেখাপড়া শিখতে দু'এক বছর লোকে কাটিয়ে আসে, আর হোমি কিনা এতগুলো বছর কাটিয়ে এলে।

—তুমি বিয়ে করেছ ?

—হ্যাঁ বাবা।

—এবিষয়ে আমাদের কিছু জানাওনি তো ?

—জানাবার দরকার হয়নি। এ আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার।

—তোমার বাবা-মা, তোমার পরিবারের কেউ জানবে না ? জানো এসব ব্যাপারে আমাদের পরিবার একটু গোঁড়া।

হোমি তখন বললেন, বংশের মর্যাদা, আমাদের সমাজের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয় এমন কাজ যে আমার দ্বারা হতে পারে এ আপনি বিশ্বাস করেন ?

—বিশ্বাস করি না বলেই তো আশ্চর্য লাগছে।

—আরো আশ্চর্য হবেন আপনারা শুনে যে, আমি জীবনে বিজ্ঞানকেই বরণ করে নিয়েছি—আর কাউকে বরণ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। 'Science is my first love' it will remain so to the last day of my life'. বিজ্ঞান আমাকে যে জ্ঞান দিয়েছে, দেশের জন্য সেই অর্জিত জ্ঞান আমি কাজে লাগাবো।

এতক্ষণে ভাবা-দম্পতির দুশ্চিন্তার যেন অবসান হলো।

হোমি ভাবা যথার্থই বিজ্ঞানলক্ষ্মীর সেবক ছিলেন এবং বিলেতে থেকে যে জ্ঞান তিনি আহরণ করেছিলেন সেই মূল্যবান সম্পদ তিনি অর্ঘ্যরূপে দেশজননীর চরণে অর্পণ করেছিলেন। আজীবন অবিবাহিত থেকে তিনি বিজ্ঞানের মাধ্যমে দেশের সেবা করেছিলেন। এই বিজ্ঞানীর জীবনের সার্থকতা এইখানেই। এইখানেই তাঁর মহত্ত্ব। স্বার্থত্যাগের এমন দৃষ্টান্ত বিরল। এই কারণেই হোমি জাহাঙ্গীর ভাবা অনন্য হয়ে আছেন।

১৯৪০।

বোম্বাই থেকে ডক্টর ভাবা একটি আবেদনপত্র পাঠালেন বাঙ্গালোরে ডক্টর রমনের কাছে। তিনি তখন এখানকার ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স-এর ডিরেক্টর। তাঁর ছাত্রজীবন থেকেই ভাবা বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন অধ্যাপক চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রমনের প্রতি। রমনের বৈজ্ঞানিক প্রতিভা বিশ্বের বিজ্ঞানীসমাজে স্বীকৃত হয়ে কিভাবে ভারতের মুখোজ্জ্বল করেছে, সেই কাহিনী তরুণ ভাবাকে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী এই বিজ্ঞানীর প্রতি গভীরভাবেই আকৃষ্ট করেছিল। রমন তাঁর কাছে একজন 'idol' হয়ে উঠেছিলেন। তাই ভারতবর্ষে ফিরে তিনি রমনকেই প্রথমে চিঠি লিখেছিলেন। তাঁর ইনস্টিটিউটে তাঁর যোগ্য কোন একটা কাজ হতে পারে কিনা, এই কথাটাই তিনি সেই চিঠিতে জানতে চেয়েছিলেন। উত্তর এলো প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই।

জহুরী জহর চেনে। চিরকালের মতো সত্য এই প্রবাদ বাক্য।

ভাবার পরিচয় অধ্যাপক রমনের কাছে অজানা ছিল না। ভাবার চিঠির উত্তরে রমন তাঁকে অত্যন্ত হৃদ্যতাপূর্ণ একটি চিঠি লিখলেন এবং শেষে লিখলেন—'আমাদের এই ইনস্টিটিউটে তত্ত্বীয় পদার্থবিজ্ঞানে Special Reader হিসাবে আপনাকে আমরা সানন্দে নিযুক্ত করতে পারি। অন্যান্য সুবিধা ব্যতিরেকে এই পদের বেতন মাসিক হাজার টাকা। আপনি যদি এই পদ গ্রহণে সম্মত থাকেন তাহলে সত্বর লিখে জানাবেন এবং যত শীঘ্র সম্ভব যোগদান করার চেষ্টা করবেন। আপনার মতো একজন কৃতবিদ্য ব্যক্তিকে এই প্রতিষ্ঠান সাদর অভ্যর্থনা জানাচ্ছে।'

রমনের কাছ থেকে আন্তরিকতাপূর্ণ এই চিঠিখানি পেয়ে ডক্টর ভাবা, বলা বাহুল্য, খুবই খুশি হলেন। রমন তখন বিশ্ববিশ্রুত বৈজ্ঞানিক ; তাঁর অধীনে কাজ করবার সুযোগ পাওয়া ভাগ্যের কথা। তাই চিঠি পাওয়া মাত্র তাঁর বাবা ও মায়ের সঙ্গে পরামর্শ করে ডক্টর ভাবা তাঁর সম্মতি জানিয়ে দিলেন। ভারতে তাঁর প্রথম কর্মস্থল ছিল বাঙ্গালোর। বিলেতে থাকবার সময় রমনকে তিনি একবার দেখেছিলেন ১৯৩০ সালে যখন অধ্যাপক রমন নোবেল প্রাইজ আনবার জন্য ওদেশে গিয়েছিলেন। যে বছরে (১৯৩৩) ভাবা নিউটন বৃত্তিলাভ করেন, সেই বছরেই রমন কলকাতার বিজ্ঞান কলেজ থেকে বাঙ্গালোরে ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউটের প্রথম ভারতীয় পরিচালক হিসাবে যোগদান করেন।

এক জায়গায় এই দুই প্রবীণ ও নবীন বিজ্ঞানীর মধ্যে মিল ছিল। ভাবা যে বছর 'ডক্টরেট' উপাধি লাভ করেন সেই বছরে (১৯৩৪) বাঙ্গালোরে প্রধানত অধ্যাপক রমনের উদ্যোগে এবং চেষ্টায় স্থাপিত হয় ইণ্ডিয়ান অ্যাকাদেমি অব সায়েন্সেস নামক একটি প্রতিষ্ঠান। এই জাতীয় প্রতিষ্ঠান ভারতে সেই প্রথম। রমনই ছিলেন এর প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি। এই সংস্থার লক্ষ্য ছিল—'জাতির সেবা।' তরুণ ভাবার জীবনের আদর্শও ছিল ঠিক তাই। বোম্বাই থেকে প্রথম যে চিঠিখানি

ভাবা বাঙ্গালোরে রমনের কাছে পাঠিয়েছিলেন তাতে তাঁর জীবনের আদর্শের কথা ব্যক্ত করে তিনি লিখেছিলেন। যে উন্নত আদর্শ নিয়ে আমি আমার কর্মজীবন শুরু করতে চাই তা হলো জাতির সেবা, দেশের সেবা। বিজ্ঞানকে আমি অর্থকরী বিদ্যা হিসাবে গ্রহণ করিনি।' এইজন্যই তো অধ্যাপক রমন সহৃদয়তার সঙ্গে এই তরুণ বিজ্ঞানীকে গ্রহণ করেছিলেন।

১৯৩৭ সালে পদার্থবিজ্ঞানে জার্মানিতে অধ্যাপক :হাইটলারের অধীনে ডক্টর ভাবা মহাজাগতিক রশ্মির বর্ষণ সম্বন্ধে যে প্রপাত তত্ত্ব নিয়ে গবেষণা শুরু করেছিলেন, বাঙ্গালোর ইনস্টিটিউট অব সায়েন্সে রীডারের পদে নিযুক্ত হয়ে তিনি আবার সেই বিষয় নিয়ে গবেষণা করতে থাকেন। ইলেক্ট্রন-পজিট্রন জুটির উদ্ভব সম্পর্কে প্রাঞ্জল তত্ত্ব রচনা করাই ছিল পদার্থবিজ্ঞানে ভাবার প্রধান অবদান। ১৯৪০ সালে বাঙ্গালোর ইনস্টিটিউটে যোগদান করার অল্প কয়েকদিন পরের একটি ঘটনা এখানে উল্লেখযোগ্য। ডক্টর ভাবার খ্যাতি ছিল পুরোগামী। বাঙ্গালোর শহরের শিক্ষিত নাগরিকগণ যখন জানতে পারল যে ডক্টর হোমি জাহাঙ্গীর ভাবা রীডার হিসাবে এখানকার ইনস্টিটিউটে যোগদান করেছেন তখন তাদের আয়োজিত এক জনসভায় কিছু বলার জন্য ভাবাকে আমন্ত্রণ করা হয়। অধ্যাপক রমন স্বয়ং এই সভায় সভাপতিত্ব করেছিলেন।

এর আগে অনেক বিজ্ঞানীর কাছ থেকে স্থানীয় অধিবাসিবৃন্দের বক্তৃতা শুনবার সৌভাগ্য হয়েছিল এবং তাঁদের সকলেই হাল্কা ধরনের বক্তৃতা করেছিলেন। ভাবার কাছ থেকেও তাঁরা সেই রকম বক্তৃতাই আশা করেছিলেন। কিন্তু সমসাময়িক বিবরণ থেকে আমরা জানতে পারি যে, সেদিনের সন্ধ্যায় বাঙ্গালোর টাউন হলে ভাবা যে ভাষণ দিয়েছিলেন তা ছিল একেবারেই আলাদা। প্রথমটায় তিনি একটু বিচলিত বোধ করেছিলেন, কিন্তু যেমন তিনি বিষয়টির গভীরে প্রবেশ করেন (তাঁর বক্তৃতার বিষয় ছিল—'বর্তমান সমাজে বিজ্ঞানের

ভূমিকা') অমনি উপস্থিত সকলেই মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে তাঁর বক্তৃতা শুনতে থাকে। সেইসঙ্গে তিনি পদার্থবিজ্ঞানের অতি আধুনিকতম বিষয় পরমাণুর কথাও প্রাঞ্জল ভাষায় উল্লেখ করেছিলেন। বলেছিলেন—'পরমাণু একটি আশ্চর্য পদার্থ; পারমাণবিক শক্তি আরো আশ্চর্য। আগামী দিনের পৃথিবীতে এই মহাশক্তির শান্তিপূর্ণ প্রয়োগের ওপরেই নির্ভর করবে বর্তমানকালে বিজ্ঞানের প্রকৃত ভূমিকা।' ডক্টর রমন সভাপতির চেয়ার থেকে বক্তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেছিলেন—'ডক্টর ভাবা আজ আপনাদের কাছে যা বললেন, তা পদার্থবিজ্ঞানের একেবারে নূতনতম বিষয়। বক্তা, সভাপতি এবং এই সভায় উপস্থিত একজন প্রখ্যাত গণিতবিদ্—সম্ভবত এই তিন জন ভিন্ন আর কারো কাছে এই সুন্দর বক্তৃতা ভালো লাগেনি।' রমনের এই মন্তব্যে সভায় হাসির তুফান উঠেছিল।

১৯৪১ সালটি ভাবার জীবনে স্মরণীয় হয়ে আছে।

এই বছর ইংলণ্ডের রয়্যাল সোসাইটির তিনি 'ফেলো' নির্বাচিত হন। তিনি এখন ডক্টর হোমি জাহাঙ্গীর ভাবা এফ. আর. এস। যে কোন বিজ্ঞানীর পক্ষে রয়্যাল সোসাইটির সদস্যপদে নির্বাচিত হওয়া বিশেষ সম্মানের কথা, গৌরবের বিষয়। জগদীশচন্দ্র, রামানুজম, রমন্, সত্যেন বোস, মেঘনাদ সাহা প্রভৃতি তাঁর পূর্ব-সূরিগণ এই দুর্লভ গৌরব অর্জন করে ভারতবর্ষের মুখ উজ্জ্বল করেছেন। তাঁর এফ. আর. এস. হওয়ার সংবাদ যখন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় তখন সেদিনের প্রভাতী সংবাদপত্রটি হাতে নিয়ে ভাবার মা তাঁর স্বামীর কাছে এসে বললেন, আজকের কাগজ দেখেছ? তোমার ছেলে এফ. আর. এস. হয়েছে। টাটা কোম্পানীর এঞ্জিনীয়ার হলে হোমি কি এই সম্মান লাভ করতো?

—না। এখন বুঝতে পারছি এঞ্জিনীয়ারিং বৃত্তি কেন ওর মনঃপুত ছিল না। বাবার ভবিষ্যদ্বাণী দেখছি নিষ্ফল হবে না।

দু'বছর পরে ডক্টর ভাবা ইনস্টিটিউটে অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত

হলেন : তার প্রতিভা দেখে রমন তাকে রীডার থেকে অধ্যাপকের পদে উন্নীত করে দিয়ে তার কৃতিত্বের পুরস্কার দিয়েছিলেন। অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হয়ে সেখানে মহাজাগতিক রশ্মি সম্বন্ধে গবেষণার একটি কেন্দ্র তার অন্যতম কীর্তি ; এজন্য রমন তাকে সব রকম সুযোগ দিয়েছিলেন। এই পদে তিনি তিন বছর ছিলেন। ইনস্টিটিউটের পদার্থবিদ্যা বিভাগটির সম্পূর্ণ দায়িত্ব রমন তাকেই দিয়েছিলেন, বলা বাহুল্য, ভাবা এই দায়িত্ব বিশেষ যোগ্যতার সঙ্গেই বহন করছিলেন। এই সময়ের মধ্যে জার্মানিতে আরব্ধ তাঁর গবেষণাটি তিনি সম্পূর্ণ করেন। আগেই বলেছি, ভাবা ইচ্ছে করলে কেমব্রিজে থেকে তার বৈজ্ঞানিক জীবন গড়ে তুলতে পারতেন, এবং সে রকম সুযোগও তিনি পেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি চেয়েছিলেন তার প্রতিভা ও অভিজ্ঞতা তার নিজের দেশে বিজ্ঞানের উন্নতিকল্পে প্রয়োগ করবেন।

অধ্যাপক হিসাবে ভাবা তার ছাত্রদের কাছে খুবই জনপ্রিয়তা অর্জন করছিলেন। মামুলি লেকচার তিনি দিতেন না। ক্লাসে যখন তিনি আসতেন তখন তার উপস্থিতিতে যেন এক আশ্চর্য পরিবেশের সৃষ্টি হতো। ক্লাসশুদ্ধ ছাত্র উৎকর্ণ থাকত তার মুখের উচ্চারিত প্রতিটি কথা শুনবার জন্য। বিজ্ঞানের মতো কঠিন বিষয়কে তিনি এমন প্রাঞ্জলভাবে ছাত্রদের সামনে তুলে ধরতেন যে তাদের বুঝতে কিছুমাত্র কষ্ট হতো না। একদিন ক্লাসে তিনি ছাত্রদের বলেছিলেন 'অসীম ধৈর্য, অপরিসীম উৎসাহ আর নিজের ওপর বিশ্বাস—এই তিনটি জিনিস যার মধ্যে নেই তার পক্ষে বিজ্ঞানের কৃতী ছাত্র হওয়া কঠিন। কেবলমাত্র প্রতিভার দৌলতে বিজ্ঞানী হওয়া যায় না, পরিশ্রম করবার ক্ষমতা থাকা চাই। পৃথিবীর যাঁরা শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী তাদের সকলেই নিরলসভাবে পরিশ্রম করতে পারতেন।' তার এই সুন্দর কথা ছাত্রদের মনের মধ্যে যেন একেবারে গেঁথে যেত।

কিন্তু গতানুগতিক অধ্যাপনার কাজ নিয়ে ভাবা সন্তুষ্ট থাকতে

পারলেন না। তাঁর প্রবণতা ছিল গবেষণার দিকে। কোন্ বিষয়ের গবেষণা ? ইংলণ্ডে থাকতেই তিনি প্রত্যক্ষ করে এসেছিলেন যে সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে তখন পদার্থবিদ্যার পঠন-পাঠনে প্রধান স্থান দেওয়া হয়েছে পরমাণুকে। সর্বত্রই এ্যাটমের কথা, সর্বত্রই নিউক্লিয়ার ফিজিক্স-এর চর্চা। কেমব্রিজে নবাগত ছাত্র হিসাবে তিনি পরমাণু-তত্ত্ব এবং এই বিষয়ে আমেরিকান পদার্থবিদ্ কমটনের কাজের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। আকৃষ্ট হয়েছিলেন আইনষ্টাইনের উদ্ভাবিত তত্ত্বের প্রতি। তখন থেকেই এই তরুণ বিজ্ঞানীর মনে এই ধারণা দৃঢ় হতে থাকে যে, বিজ্ঞান জগতে একটি নতুন যুগ আসন্ন হয়ে এসেছে। সেই যুগের নাম Atomic Age বা পরমাণু যুগ। তখন থেকেই তাঁর কল্পনা উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছিল এই বিষয়ে এবং তাঁর মনের মধ্যে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল এক নতুন দিগন্ত। সেই দিগন্ত রচিত হয়েছিল রহস্যময় পরমাণু দিয়ে। তিনি একজন পরমাণু-বিজ্ঞানী (Atomic Scientist) হবেন—মনের নিভৃতে তরুণ হোমি ঠিক এই রকম একটি আশা পোষণ করেছিলেন যখন তিনি ছাত্রজীবন শেষ করে কর্মজীবনে প্রবেশ করেছিলেন।

ভারতবর্ষে তখন এই বিষয়ে গবেষণা করবার তেমন সুযোগ ছিল না বললেই হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ যখন শুরু হলো তখন থেকেই ইংলণ্ড ও ফরাসী দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির গবেষণাগারে পরমাণু সম্পর্কে শুধু পঠন-পাঠন নয়, হাতে-কলমে কাজ পর্যন্ত শুরু হয়ে গিয়েছিল। সেই সময়ে এদেশে প্রথম যাঁর দৃষ্টিতে এই বিষয়টি এসেছিল তিনি হলেন পদার্থবিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহা। কিন্তু তাঁর পক্ষে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজের অধ্যাপক হিসাবে এই ক্ষেত্রে অধিক দূর অগ্রসর হওয়া সম্ভব ছিল না। বাঙ্গালোরে অধ্যাপনাকালে ডক্টর ভাবা সর্বক্ষণ এই সম্পর্কে চিন্তা করতেন—চিন্তা করতেন কি করে ভারতবর্ষকে আণবিক যুগে পৌঁছে দেওয়া যায়। তাঁর এই চিন্তার পরিণতি ছিল টাটা ইনস্টিটিউট অব ফাণ্ডামেণ্টাল রিসার্চ নামক একটি

নতুন বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হওয়ার ইতিহাস এই রকম।

১৯৪৪, ১২ মার্চ।

ঐ তারিখে বাঙ্গালোর থেকে অধ্যাপক ভাবা বোম্বাইতে স্যর দোরাবজী টাটা ট্রাস্ট-এর[১] কর্তৃপক্ষের কাছে একটি চিঠি লিখেছিলেন। এটি ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ চিঠি। জার্মানি, ইংলণ্ড ও ফরাসীদেশে বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য তিনি যে রকম প্রতিষ্ঠান দেখে এসেছিলেন, ভারতবর্ষে ঠিক ঐরকম একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপনের কথা-ই তিনি ঐ চিঠিতে আলোচনা করেছিলেন। মৌলিক গবেষণার জন্য একটি ইনস্টিটিউট স্থাপন ভারতবর্ষের পক্ষে যে কতদূর প্রয়োজনীয় সেই কথা তিনি বিশেষ প্রত্যয়ের সঙ্গেই বলেছিলেন। ভাবার নাম ট্রাস্টের কর্তৃপক্ষের কাছে একেবারে অপরিচিত ছিল না। সেই ঐতিহাসিক চিঠির শেষে এই লাইনটি ছিল—'মৌলিক গবেষণার জন্য আমি এমন একটি ছোট্ট সংস্থা স্থাপন করতে চাই যেখানে তৈরি হবে ভবিষ্যতের জন্য শ্রেষ্ঠ ভারতীয় গবেষক, যেমন য়ুরোপের এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলিতে হয়ে থাকে। আজ থেকে দশ কি বিশ বছর পরে শক্তি উৎপাদনের জন্য যখন পরমাণুশক্তিকে প্রয়োগ করা হবে তখন এই কাজের জন্য যেন বাইরে থেকে লোক আনতে না হয়—আমার পরিকল্পিত প্রতিষ্ঠানে আমি পদার্থবিজ্ঞানে ঠিক এই শ্রেণীর এক সুশিক্ষিত ছাত্রগোষ্ঠী তৈরি করতে চাই।' ভারতবর্ষকে প্রগতির পথে নিয়ে যাওয়ার জন্য ভাবার দূরদর্শিতার পরিচায়ক ছিল এই পত্রখানি। এখানে মনে রাখা দরকার যে, হিরোশিমার ওপর পরমাণু বোমার বিস্ফোরণের ঠিক এক বছর আগে ভাবা এই চিঠিখানা লিখেছিলেন—তখনো পর্যন্ত পারমাণবিক শক্তির কথা বিজ্ঞানীদের আলোচনার

১. জামসেৎজী টাটার বড় ছেলে স্যর দোরাবজী টাটা মারা গেলে পরে তাঁর নামে একটি ট্রাস্ট গঠিত হয়েছিল।

বিষয় হয়ে ওঠেনি। এইজন্যই তো হোমি জাহাঙ্গীর ভাবাকে ভারতবর্ষে পরমাণু বিজ্ঞানের জনক বলা হয়[১]।

তখন পৃথিবীতে অধিকাংশ বিজ্ঞানী কেবলমাত্র একটি বিষয়ে পরমাণুর প্রয়োগের কথা চিন্তা করতেন—এর ধ্বংস করার শক্তি কতদূর, এইটাই তাঁরা চিন্তা করতেন। অন্যদিকে ভাবা ও ভাবার মতো মুষ্টিমেয় কয়েকজন বিজ্ঞানী চিন্তা করতেন একেবারে অন্যভাবে—ঐ আণবিক শক্তিকে মানুষের উন্নতি ও কল্যাণের কাজে প্রয়োগ করার কথাই তাঁরা ভাবতেন।

যথাসময়ে ভাবা তাঁর চিঠির উত্তর পেলেন। উৎসাহ জনক উত্তর। ট্রাস্টের কর্তৃপক্ষগণ তাঁকে এই ব্যাপারে সকল দায়িত্ব দিতে চাইলেন ও এই বিষয়ে একটি সম্পূর্ণ পরিকল্পনা রচনা করতে অনুরোধ করলেন। সেই উত্তর তিনি রমনকে দেখালেন। তাঁর মতো একজন প্রতিভাবান অধ্যাপক চলে গেলে ইনস্টিটিউটের যে ক্ষতি হবে, এ কথা জেনেও তিনি ভাবার আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করার অন্তরায় হয়ে দাঁড়ালেন না। রমনের এই মহানুভবতা তরুণ ভাবাকে মুগ্ধ করেছিল। রমন যখন তাঁকে বলেছিলেন—'বিজ্ঞানী হিসাবে আমাদের উভয়ের লক্ষ্য যখন এক—জাতির সেবা করা—তখন আপনাকে আনন্দিত মনেই আমি বিদায় সম্ভাষণ জানাব। আপনার কর্মের পরিধি বিস্তৃত হোক, এই আমার একান্ত ইচ্ছা। দূর থেকে আমি আপনার সফলতার সংবাদে আনন্দিত হব।'—তখন ডক্টর ভাবার সমস্ত হৃদয়-মন এই বর্ষীয়ান বিজ্ঞানীর প্রতি শ্রদ্ধায় ভরে গিয়েছিল।

ভাবা যখন বাঙ্গালোর ইনস্টিটিউটের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন তখন

---

১. 'By all means the distinguished atomic scientist Dr. Homi Jehangir Bhava deserves to be recognised as father of Nuclear Science in India.' এই কথা ১৯৫৪ সালে বলেছিলেন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু যখন ভারত সরকার কর্তৃক ভাবা পদ্মভূষণ উপাধিতে ভূষিত হন।

একবার অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা তাঁকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটা বক্তৃতা দেবার জন্য আমন্ত্রণ জানান। মহাজাগতিক রশ্মির বর্ষণ তত্ত্ব সম্পর্কে তাঁর এই বক্তৃতা মহাজাগতিক রশ্মি ও পরমাণু পদার্থ-বিদ্যার চর্চা ও গবেষণা বিষয়ে প্রভূত আগ্রহের সৃষ্টি করে এবং তারই ফলে অধ্যাপক সাহার উদ্যোগে কলকাতায় ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স নামক প্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত হয়।

১৯৪৫। জুন মাস।

ভাবার জীবনে আর একটি স্মরণীয় বৎসর।

এই বছর তিনি বোম্বাইতে স্যর দোরাবজী টাটা ট্রাস্টের উদ্যোগে কাম্বালা পর্বতে একটি ভাড়া করা বাড়িতে টাটা ইনষ্টিটিউট অব ফাণ্ডামেণ্টাল রিসার্চ স্থাপিত হয়। ভাবাই ছিলেন এর প্রতিষ্ঠাতা-পরিচালক। তিনি ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে মহাজাগতিক রশ্মি ও কণিকা-পদার্থবিদ্যা (Quantum physics) সম্পর্কিত গবেষণায় উৎসাহী সুযোগ্য কর্মীদের এখানে সমবেত করেছিলেন। সরকারী অর্থ সাহায্য ব্যতিরেকেই এই প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছিল এবং এর উন্নতিবিধানে অধ্যাপক ভাবার যে সুদক্ষ সংগঠক মূর্তি আমরা দেখতে পাই তার কোন তুলনা হয় না। পরবর্তী কালে এই প্রতিষ্ঠানটি কোলাবায় একটি নব নির্মিত ভবনে স্থানান্তরিত হয়। ভাবার নেতৃত্বে অল্পদিনের মধ্যেই এটি আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করেছিল। মহাজাগতিক রশ্মির গবেষণায় ভাবার আগ্রহের দরুণ পদার্থবিদ্যার এই বিভাগে গবেষণারত অনেক খ্যাতনামা বিজ্ঞানী ভারতে এসেছিলেন এবং টাটা ইনস্টিটিউট অব ফাণ্ডামেণ্টাল রিসার্চ প্রতিষ্ঠানে তাঁদের কেউ-কেউ স্বল্পকাল, কেউ কেউ দীর্ঘকাল কাজ করে যান। ভারতে আধুনিক পরমাণু যুগের সূচনা এইখানেই হয়েছিল। ভারতের অগ্রগতির রাজপথে একটি লক্ষণীয় দিক্‌চিহ্ন ভাবার প্রতিষ্ঠিত এই সংস্থাটি—পরমাণুবিজ্ঞানের পতাকা এইখানে তিনি প্রথম উত্তোলন

করে এদেশে যুগান্তর এনেছিলেন। এই সংস্থাটি স্থাপন করে ডক্টর ভাবা ভারতীয় বিজ্ঞানী ও পূর্তবিদ্‌দের সামনে বিজ্ঞান ও আধুনিক কারিগরি বিদ্যার বিরাট ক্ষেত্র উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন। ভাবার এই কর্মকীর্তি আজো ভারতের সেরা বৈজ্ঞানিক গবেষণা কেন্দ্র হয়ে আছে।

একদিন ইনস্টিটিউটে ক্লাস নিচ্ছিলেন ভাবা। যদিও তিনি ডিরেক্টর তবু মাঝে মাঝে পদার্থবিজ্ঞানে প্রাগ্রসর ছাত্রদের ক্লাসে এসে তিনি বক্তৃতা করতেন। তাঁর এই জাতীয় বক্তৃতা সত্যিই শুনবার মতো ছিল ; যা বলতেন সঙ্গে সঙ্গে তা ব্ল্যাকবোর্ডে অঙ্ক করে বুঝিয়ে দিতেন। জার্মান বৈজ্ঞানিক অটো হ্যান তখন পরমাণু বিভাজন করেছেন। সেই বিষয়টা ছাত্রদের তিনি বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন। 'বিশেষ অবস্থায় কোন কোন মৌলিক পদার্থের কতকগুলো পরমাণুর ওজন বদলে যায়, অথচ পারমাণবিক সংখ্যা সমান থাকে। এই রকম পরমাণুকে ঐ মৌলিক পদার্থের আইসোটোপ বলা হয়।'

—আইসোটোপ কি, স্যর ?

—একই পরমাণু অঙ্কবিশিষ্ট ভিন্ন ভিন্ন পরমাণু ভারযুক্ত মৌল। এগুলি রাসায়নিক ধর্মে অভিন্ন কিন্তু ভৌতগুণে সামান্য বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হয়। বেশির ভাগ মৌলই একাধিক আইসোটোপের মিশ্রণ। আইসোটোপের পারমাণবিক ওজন ব্যতীত আর সব রকম রাসায়নিক ধর্ম সর্বাংশে ঐ মৌলিক পদার্থের মতোই থাকে। একই মৌলিক পদার্থের বিভিন্ন পারমাণবিক ওজনের বিভিন্ন আইসোটোপ হতে পারে। পরমাণুর কেন্দ্রিকের নিউট্রন সংখ্যার কম বেশির ফলে আইসোটোপ সৃষ্টি হয়। ইলেকট্রন, প্রোটন প্রভৃতি কণিকায় পরমাণু গঠিত। এই পরমাণুর বিস্ফোরণে মুহূর্ত মধ্যে প্রচণ্ড পারমাণবিক শক্তি বিমুক্ত হয়ে ভয়াবহ ধ্বংসলীলার সৃষ্টি করে। পরমাণু-বিভাজনের ফলে বিমুক্ত এই বিরাট শক্তিকে শান্তির কাজে, দেশের নানাবিধ উন্নয়নের কাজেও প্রয়োগ করা যায়। তোমরা তাই করবে।

১৯৪০ সালে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শুরুতে ভাবা ভারতে আসেন,

কিন্তু মুখ্যত এই যুদ্ধের জন্যই তিনি আর কেমব্রিজে ফিরে যেতে পারেন নি। যুদ্ধের পর অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় ভাবাকে তত্ত্বীয় পদার্থবিদ্ হিসাবে নিযুক্ত করতে চেয়েছিল ; বেতনের পরিমাণও নিতান্ত কম ছিল না। কিন্তু ঐ আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করে ভাবা ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক প্রাইসকে এক চিঠিতে লিখেছিলেন— 'আমাদের মতো লোকের উচিত স্বদেশে গবেষণার উপযোগী কেন্দ্র স্থাপন করা। সকলের আগে আমার দেশ—আমি এই আদর্শে বিশ্বাসী এবং এই আদর্শকে সামনে রেখেই আমি এখন কাজ করে চলেছি।' এই কথার মধ্যে আমরা যেন দেখতে পাই দেশপ্রেমিক হোমি জাহাঙ্গীর ভাবাকে। এইখানেই তাঁর মহত্ব।

॥ পাঁচ ॥

বাঙ্গালোরে থাকতেই আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক মহলে ভাবার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল। এই সময়ে তিনি কলম্বিয়া, এডিনবার্গ, কেমব্রিজ ও ভ্যানকুভার প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ে বত্তৃতা দেবার জন্য আমন্ত্রিত হতেন। ভারতের বিজ্ঞানীরা কতদূর এগিয়ে যেতে পেরেছে, তাঁর বক্তৃতায় ভাবা সে-কথার উল্লেখ করতেন। প্রত্যেকটি বক্তৃতায় একটি কথা তিনি বার বার বলতেন : 'A scientist do not belong to a particular nation', অর্থাৎ 'একজন বিজ্ঞানী কোন একটি বিশেষ জাতির অন্তর্ভুক্ত নন'। বিজ্ঞানী মাত্রেই বিশ্বনাগরিক, এই সর্বজনীন মনোবৃত্তি আমরা পৃথিবীর প্রায় সকল শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীদের মধ্যেই দেখতে পাই। তাঁদের শ্রেষ্ঠত্ব তো এইখানেই।

'যারা মানব সমাজের কল্যাণের জন্য কাজ করে থাকেন তাঁদের পক্ষে বিজ্ঞানের সকল দরজা খোলা থাকা উচিত।' এই কথা ভাবা বলতেন এবং এই উচ্চ ধারণা তিনি তাঁর মনের মধ্যে পোষণ করতেন বলে তিনি বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিনিময় নীতির পক্ষপাতী ছিলেন এবং এই ক্ষেত্রে বোধ করি বিজ্ঞান জগতে তিনিই একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন

করেছিলেন। দেশ-বিদেশের বহু প্রখ্যাত বিজ্ঞানীকে তাই তিনি একই মঞ্চে সমবেত করেছিলেন ও তাঁদের দিয়ে টাটা ইনষ্টিটিউটে বক্তৃতা দেওয়াতেন। এর আগে ভারতবর্ষে এই জাতীয় প্রয়াস কখনো দেখা যায় না এবং এর ফলে ভারতীয় বিজ্ঞানীরা ভারতের বাইরে বিজ্ঞান জগতের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার অধিকতর ভালো সুযোগ পেয়েছিলেন। এই পরিচয় লাভ পরোক্ষভাবে তাদের মনে আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে তুলত। শুধু তাই নয়। এইভাবে তারা অন্যদেশ দেখবার ও সেখানকার বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে পরিচিত হওয়ার একটা সুযোগ পেত।

'India's Bhava', অর্থাৎ 'ভারতের ভাবা'—ভারতবর্ষের বাইরে বিশ্বের বিজ্ঞানী মহলে হোমি জাহাঙ্গীর ভাবা যখন খ্যাতিলাভ করেছেন সেই সময়ে একদিন তাঁর কাছে এলো একটি অপ্রত্যাশিত আহ্বান। আহ্বান এলো স্বাধীন ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরুর কাছ থেকে। ভাবা তখন টাটা ইনষ্টিটিউটের ডিরেক্টর। ভাবীকালের ভারতবর্ষকে আণবিক শক্তিতে শক্তিশালী করার স্বপ্ন দেখছেন তিনি আর তাঁর সেই স্বপ্নকে বাস্তবে রূপায়িত করবার জন্য একাগ্রচিত্তে এক বৃহৎ ছাত্রগোষ্ঠীকে নিজের হাতে এই নতুন বিদ্যায় পারঙ্গম করে তুলছেন।

নেহরু তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে একখানা চিঠি পাঠিয়েছিলেন। সেই চিঠির বক্তব্য ছিল খুবই সংক্ষিপ্ত। 'আপনার সঙ্গে একটি প্রয়োজনীয় বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করতে চাই। আপনি যদি একদিন সময় করে ত্রিমূর্তি মার্গে আমার বাসভবনে আসেন তাহলে খুব আনন্দিত হব।' চিঠিখানা পেয়ে ভাবা প্রথমে খুবই বিস্মিত হয়েছিলেন। নেহরুর দেশপ্রেমের জন্য যতটা না হোক তাঁর মধ্যে আধুনিকতা বিমণ্ডিত তারুণ্যের প্রকাশ দেখে ভাবা তাঁকে শ্রদ্ধা করতেন। কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে এই অসাধারণ ব্যক্তিত্বশালী দেশনেতার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ তাঁর কখনো হয়নি। তাই এই আহ্বানে তাঁর সমস্ত

সত্তা যে সেদিন উদ্বেলিত হয়ে উঠেছিল, এমন অনুমান আমরা সহজেই করতে পারি।

এর পরের ঘটনা আরো চমকপ্রদ।

ডক্টর ভাবা একদিন সকালে এলেন প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে। সময় ও দিন ধার্য করে আসবার কথা ভাবা আগে থেকেই এক চিঠিতে নেহরুকে জানিয়ে দিয়েছিলেন। রাজধানী দিল্লীর ত্রিমূর্তিমার্গে অবস্থিত লোহার ফটকওয়ালা যে বিশাল বাড়িটা ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন হিসাবে নির্ধারিত হয়েছিল, ব্রিটিশ-শাসনের আমলে ভারতের প্রধান সেনাপতি থাকতেন ঐ বাড়িটায়।

ডক্টর ভাবা এলেন। প্রধানমন্ত্রীর সেক্রেটারি ফটকের সামনেই তাঁকে অভ্যর্থনা করে ভেতরে একেবারে নেহরুর খাস কামরায় নিয়ে এলেন। প্রধানমন্ত্রী আন্তরিকতার সঙ্গে তাঁকে গ্রহণ করলেন। সকাল আটটায় এসেছিলেন, ভাবা, ভেবেছিলেন দশ-পনর মিনিটের বেশি কথাবার্তা হবে না। কিন্তু দু' ঘণ্টা পরে যখন তিনি প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে বিদায় নিলেন তখন তাঁর বিস্ময়ের সীমা-পরিসীমা ছিল না। কিসের জন্য বিস্ময়? ভারতের প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে যে একজন প্রথম শ্রেণীর বিজ্ঞানী আছেন এবং তিনি যে পারমাণবিক শক্তি সম্পর্কে অনেক খবর রাখেন—এই তথ্যটা জেনে তিনি রীতিমতো বিস্মিত হয়েছিলেন। কিন্তু বিস্ময়ের শেষ এইখানেই ছিল না। এই স্মরণীয় সাক্ষাৎকারের এক সপ্তাহকাল পরে প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে দ্বিতীয় একখানি চিঠি পেলেন ভাবা। সেই চিঠিতে নেহরু তাঁকে জানিয়েছেন ঃ 'ভারত সরকার পারমাণবিক শক্তি উৎপাদন-সংক্রান্ত একটি সরকারী প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে চান এবং এই বিষয়ে লোকসভায় শীঘ্রই একটি বিল আনা হবে। আপনাকেই আমি এর সকল দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে সমর্পণ করতে চাই।'

যে স্বপ্ন বুকে নিয়ে তিনি কেমব্রিজ থেকে দেশে ফিরেছিলেন, যে স্বপ্নকে চরিতার্থ করবার জন্য তিনি প্রথমে বাঙ্গালোরে রমনের অধীনে

অধ্যাপনার কাজ নিয়েছিলেন এবং পরে টাটাদের অর্থানুকুল্যে একটি গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন করে ভাবীকালের কর্মীদের তৈরি করছিলেন—সেই তাঁর এতদিনকার পোষিত স্বপ্ন সার্থক হতে চলেছে, প্রধানমন্ত্রীর দ্বিতীয় চিঠিতে তারই অভ্রান্ত ইঙ্গিত ভাবা পেলেন।

এই চিঠিখানা যখন তিনি তাঁর মাকে দেখালেন তখন মেহরাবাঈ ভাবা তাঁর স্বামীকে বললেন—'তুমি তো হোমিকে টাটা কোম্পানীর একজন এঞ্জিনীয়ার করতে চেয়েছিলেন, এখন কিরকম মনে হয়। তোমার ছেলে এখন দেশের কত বড় দায়িত্বজনক পদ গ্রহণ করতে চলেছে।' হোমি ভাবা তাঁর স্ত্রীর এই কথার যে কোন প্রতিবাদ করেন নি, তা তোমরা বুঝতেই পারো।

১৯৪৮ সাল।

ভারতবর্ষের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ বৎসর।

হোমি জাহাঙ্গীর ভাবার জীবনেও। ভারতের প্রধানমন্ত্রী তার দূরদৃষ্টি বলে উপলব্ধি করেছিলেন যে বিশ্বের শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলির তুলনায় ভারতবর্ষ এখনো পিছিয়ে আছে। পৃথিবীতে পরমাণু যুগ এসে গিয়েছে, হিরোসিমায় পরমাণু বোমার বিস্ফোরণ ঘটেছে। বিজ্ঞান আজ মানুষের হাতে এক অচিন্ত্যনীয় শক্তি তুলে দিয়েছে। স্বাধীন ভারতবর্ষকে সেই শক্তি অর্জন করতে হবে—পারমাণবিক শক্তিতে স্বাধীন ভারতকে শক্তিশালী হতে হবে। লোকসভায় দাঁড়িয়ে এই কথা বলছিলেন প্রধানমন্ত্রী। তুমুল হর্ষধ্বনির মধ্যে ও বিনা বিতর্কে লোকসভায় একটা নতুন আইন গৃহীত হলো। সেই আইনটির নাম Atomic Energy Act of 1948 এবং যথাসময়ে এই আইনটি গভর্নর-জেনারেলের অনুমোদন লাভ করে। এই আইনের ভিত্তিতেই ১৯৪৯ সালে গঠিত হয় পারমাণবিক শক্তি কমিশন। ভারত সরকার ডক্টর হোমি জাহাঙ্গীর ভাবাকে এই কমিশনের চেয়ারম্যান পদে নিযুক্ত করেন এবং এই পদাধিকারের

বলে তিনি ভারত সরকারের পারমাণবিক শক্তি দফতরের সেক্রেটারী পদেও নিযুক্ত হন। তখন তার বয়স মাত্র চুয়াল্লিশ বছর। এখানে উল্লেখ করা দরকার যে, এই দায়িত্ব গ্রহণ করলেও টাটা ইনস্টি-টিউটের সঙ্গে ভাবার সম্পর্ক কখনো বিচ্ছিন্ন হয়নি।

পারমাণবিক শক্তি আইন পাশ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীন ভারতবর্ষ এক নতুন পদে পদক্ষেপ করল। কমিশনের প্রথম সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হয়েছিলেন ডক্টর কে. কৃষ্ণান—ইনি তখন ছিলেন ন্যাশনাল ফিজিক্যাল ল্যাবোরেটরির ডিরেক্টর আর সেক্রেটারী-সদস্য হিসাবে নিযুক্ত হন ডক্টর শান্তিস্বরূপ ভাটনগর। এই তিন জনই—ভাবা, কৃষ্ণান ও ভাটনগর—ছিলেন শীর্ষস্থানীয় পদার্থ বিজ্ঞানী এবং তিনজনই ইংলণ্ডের রয়্যাল সোসাইটির 'ফেলো' ছিলেন। এই গুরুত্ব পূর্ণ কমিশনটির গঠনে প্রধানমন্ত্রী নেহেরু যে তিন জনকে নির্বাচন করেছিলেন তাদের প্রত্যেকেই যে সর্বাংশে যোগ্য ব্যক্তি ছিলেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। বস্তুত ইহা গঠিত হওয়ার অল্পকাল মধ্যে কমিশনের অগ্রগতি ও ট্রমবের সাফল্যের পিছনে ছিল এই তিনজন প্রতিভাধর বিজ্ঞানীর মিলিত কর্মপ্রয়াস ও চিন্তা। কমিশনের দায়িত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত হওয়ার পর ভাবার যেন এক মুহূর্ত বিশ্রাম ছিল না। এখানে উল্লেখ করা দরকার যে পারমাণবিক শক্তি সম্পর্কে ভাবার কতকগুলি ধ্যান ধারণা ছিল এবং সেগুলি ছিল খুবই সুস্পষ্ট একটি প্রবন্ধে তিনি এই বিষয়টির সকল দিক তন্ন তন্ন করে আলোচনা করেছিলেন তার সেই বিখ্যাত প্রবন্ধটির নাম—'ভারতবর্ষের উন্নয়নে পারমাণবিক শক্তির ভূমিকা'। এই প্রবন্ধে তিনি লিখেছিলেন—'আজকাল শোনা যায় যে, আমরা নাকি বিজ্ঞানের একটা বৈপ্লবিক যুগের দ্বারপ্রান্তে এসে গেছি যেমন এর আগে পৃথিবীর অনেক দেশ শিল্প ও কৃষি-বিপ্লবের ভেতর দিয়ে অগ্রসর হয়েছিল। এই বিপ্লবকে বলা হয়েছে পারমাণবিক বিপ্লব। ভারতবর্ষের পক্ষে এই বিপ্লব যে কিরকম গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে সে-বিষয়ে আমাদের দেশে

অনেকেরই মনে কোন ধারণাই নেই। স্বাধীন ভারতবর্ষ এখন শিল্পোন্নয়নের পথে যাত্রা করবে যার ফলে দেশের লোকের জীবন ধারণের মান উন্নত হবে। এ সবই সম্ভব হতে পারে যদি আমরা ব্যাপকভাবে পারমাণবিক শক্তিকে কাজে লাগাতে পারি। অর্থ-নৈতিক ও শিল্পের উন্নয়নের ওপরই নির্ভর করে জীবনধারণের মানের উন্নয়ন।'

প্রকৃতপক্ষে প্রধানমন্ত্রী নেহেরু এই প্রবন্ধটি পাঠ করেই ভাবার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। প্রথম যখন নেহেরুর সঙ্গে তার সাক্ষাৎকার হয় তখন ভাবা তার সামনে একটি চিত্র তুলে ধরেছিলেন। তিনি বুঝিয়েছিলেন যে অদূর ভবিষ্যতে যখন তেল ও কয়লার পুঁজি ফুরিয়ে আসবে তখন শিল্পোন্নয়নের কাজ ব্যাহত হবে। সেই বিপদকে এড়াবার জন্য দরকার পরমাণু শক্তির। এই শক্তির সাহায্য ব্যতিরেকে দেশের সর্বাঙ্গীন উন্নতি সম্ভব নয়। আগামীদিনে বৈদ্যুতিক শক্তির বেশির ভাগই এই পারমাণবিক শক্তির সাহায্যে উৎপাদন করতে হবে। তখন নেহেরু একটি প্রশ্ন রেখেছিলেন ভাবার সামনে—খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন।

—এই শক্তি উৎপাদনের উপযোগী উপকরণ এদেশে পাওয়া যাবে কিনা?

—আমি গভীরভাবেই একথা চিন্তা করেছি; শুধু চিন্তা করা নয়, খোঁজখবর নিয়ে দেখেছি। এই শক্তি উৎপাদনের জন্য দুটি বস্তুর দরকার স্বাভাবিক ভাবেই যা পাওয়া যায়। তার একটা ইউরেনিয়াম, অপরটি থোরিয়াম। ভারতবর্ষের খনিতে যে পরিমাণ থোরিয়াম আছে পৃথিবীর অন্য কোন দেশে তা নেই। ইউরেনিয়াম এদেশে নেই। অন্য দেশ থেকে আমদানী করতে হবে অথবা একটি বিশেষ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে থোরিয়াম থেকে ইউরেনিয়াম উৎপাদন করতে হবে। পারমাণবিক শক্তি উৎপাদনের জ্বালানী (fuel) হিসাবে আরো একটা জিনিসের দরকার—প্লুটোনিয়াম। আমি

তদন্ত করে দেখেছি ভারতবর্ষে প্রচুর পরিমাণ মোনাজাইট পাওয়া যায়।

—মোনাজাইট কি?

—এক রকম খনিজ পদার্থ যার মধ্যে সিরিয়াম, থোরিয়াম এবং নানা রকমের rare earth বা দুষ্প্রাপ্য মৃত্তিকা, মিশ্রিত থাকে।

—মোনাজাইট কোথায় পাওয়া যায়?

—দক্ষিণ ভারতের সমুদ্রতীরে বালুকা পাওয়া যায়?

সেদিন পারমাণবিক শক্তি সম্পর্কে ভাবার জ্ঞানের পরিধি দেখে নেহেরু বিস্মিত হয়েছিলেন এবং এই কারণেই তিনি তাঁকে কমিশনের চেয়ারম্যান পদে নিযুক্ত করেছিলেন। এইভাবে সেদিন তাঁর জীবনে শুরু হয়েছিল একটা নতুন অধ্যায়ের; যিনি এতকাল গবেষণা নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন এইবার তিনি নেতৃত্ব দিয়ে এগিয়ে এলেন।

পারমাণবিক শক্তির লৌহপথে পদক্ষেপ করল ভারতবর্ষ ১৯৪৮ সালে। এর কার্যসূচীর পরিকল্পনা ভাবা বিস্তারিত ভাবেই রচনা করলেন। এই পরিকল্পনাকে তিনটি প্রধান স্তরে ভাগ করা হয়—(১) পরমাণু সংক্রান্ত গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ সম্পর্কে ভারতের মৃত্তিকায় তদন্ত চালানো; (২) প্রাপ্ত খনিজ পদার্থগুলির সংশোধনের জন্য কয়েকটি কারখানা স্থাপন করা; (৩) গবেষণার প্রয়োজনে কয়েকটি পারমাণবিক রিঅ্যাক্টর তৈরি করা এবং (৪) মৌলিক গবেষণা চালিয়ে যাওয়া। ১৯৫২ সালের আগেই ভূতত্ত্ব বিভাগের পারমাণবিক খনিজ শাখার উদ্যোগে ব্যাপক তদন্তের কাজ শেষ হয়। এই তদন্তের ফলে জানা গেল যে, বিহারের জাদুগুড়া ও কেরালার সালওয়ে অঞ্চলে যথাক্রমে প্রচুর পরিমাণে মোনাজাইট ও থোরিয়াম সঞ্চিত আছে। অ্যাটমিক এনার্জি কমিশনের অধীনে বোম্বাইয়ের ট্রমবেতে ১৯৫৪ সালে স্থাপিত হলো একটি পারমাণবিক শক্তি

১. সমগোত্রীয় কতকগুলি দুষ্প্রাপ্য মৌলিক ধাতুকে rare earth বলা হয় সিরিয়াম ধাতু সহ প্রায় ষোলটা ধাতু এর অন্তর্গত।

গবেষণা কেন্দ্র[1]। ভাবাই ছিলেন এর ডিরেক্টার বা পরিচালক। টাটা ইনস্টিটিউটে যে কর্মীগোষ্ঠীকে তিনি তৈরি করেছিলেন তাঁদেরই অনেককে তিনি এই কেন্দ্রে নিযুক্ত করলেন। আমরা যে সময়ের কথা বলছি তখন সমস্ত ভারতবর্ষে পরমাণু বিজ্ঞানে পারদর্শী একশো জনের বেশি কর্মী পাওয়া যেত না। দূরদর্শী ভাবা সেই অভাব দূর করবার জন্য আগে থেকে টাটা ইনস্টিটিউটে একদল সুদক্ষ কর্মী তৈরি করে নিয়েছিলেন। এদেরকেই তিনি এখন নব-স্থাপিত গবেষণা কেন্দ্রে নিয়ে এলেন।

এক বিরাট কর্ম যজ্ঞের সৃষ্টি হলো ট্রমবেতে।

ভাবার অসাধারণ সক্রিয় মস্তিষ্ক এখন যেন আরো সক্রিয় হয়ে উঠলো। একটা বিরাট ব্যাপারে নেতৃত্ব দিতে ভাবা তাঁর সমস্ত প্রতিভা ও পরিশ্রম নিয়োগ করলেন। তিনি যে একজন কত বড় সংগঠক ছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া গেল এইবার। কেন্দ্রে তিনি তাঁর ছাত্রদের সমবেত করে এই নতুন কাজে আত্মনিয়োগ করতে উৎসাহিত করলেন এবং তাদের প্রত্যেককেই বললেন, 'সকলের আগে আমাদের দেশ'—এই হবে তোমাদের প্রত্যেকের আদর্শ। ভারতবর্ষকে আমরা পারমাণবিক শক্তিতে শক্তিশালী করে তুলব, কিন্তু সেই শক্তিকে আমরা কখনো ধ্বংসের কাজে প্রয়োগ করব না—একে আমরা ব্যবহার করব দেশের সামগ্রিক কল্যাণে ও শিল্পের উন্নয়নে।'

১৯৫১ সালটি দুটি কারণে ভাবার জীবনে স্মরণীয় হয়ে আছে। প্রথম এই বছর তিনি ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হলেন। এই সম্মান তাঁর প্রাপ্য ছিল। ভারতীয় বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি তখন তাঁর ওপর নিবদ্ধ হয়েছে। দ্বিতীয়, এই বছর কেরালায় রেয়ার আর্থ প্ল্যাণ্টের কাজ শুরু হয় এবং পরের বছর থেকেই এখানে মোনাজাইটের উৎপাদন আরম্ভ হয়। ১৯৫৩ সালে ট্রমবেতে স্থাপিত

---

১. ভাবার মৃত্যুর পর এর নামকরণ করা হয়েছে Bhabha Atomic Research Centre.

হয় থোরিয়াম প্ল্যাণ্ট। ১৯৫৩ সাল, ৪ঠা অগস্ট। বোম্বাইতে সেবার খুব বর্ষা। একাদিক্রমে দু'দিন দু'রাত ধরে প্রবল বর্ষণ চলেছিল। ভাবা সেই সময় তাঁর সহকর্মীদের নিয়ে ও দেশীয় উপাদানের সাহায্যে ট্রমবেতে তৈরি হলো 'অপ্সরা'—ভারতবর্ষের প্রথম রিয়্যাক্টর। এজন্য গ্রেট ব্রিটেন থেকে শুধু ইউরেনিয়াম আমদানী করা হয়েছিল। ঘুম নেই, খাওয়া নেই, বিশ্রাম নেই—সেই ঘোর দুর্যোগের মধ্যে দিনরাত কাজ করে অপ্সরার নির্মাণ কার্য ত্রুটিহীন ভাবে সমাপ্ত হয়। এই রিয়্যাক্টর তৈরি করার জন্য ভারতবর্ষের বাইরে থেকে একটি বিশেষজ্ঞকে আনতে হয়নি; দেশের বিজ্ঞানীদের সাহায্যেই এই অসাধ্যসাধন করেছিলেন ভাবা।

১৯৫৬ সালের সেই স্মরণীয় ৪ঠা অগস্ট ভারতবর্ষ যেন গরুর গাড়ির যুগকে পেছনে ফেলে পারমাণবিক যুগে পৌঁছে গিয়েছিল। এই ঘটনার দশ বছর পরে, 'অপ্সরার দশম বার্ষিকী উপলক্ষে ভারত সরকার সদ্য পরলোকগত ভাবার স্মৃতিতে ডাকটিকিট বের করেন তখন ভারতবাসী এই পরমাণু বিজ্ঞানীকে বেদনাহত চিত্তে স্মরণ করেছিল।

পরমাণু-শক্তি কমিশনের সভাপতি-রূপে ভাবা পরমাণু থেকে বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদনের জন্য প্রথম পরমাণু চুল্লী-কেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনা করেন। ঐ রকম একটি শক্তি কেন্দ্র তিনি রাজস্থানেও স্থাপনের পরিকল্পনা নিয়েছিলেন।

১৯৫৫ সালটি ভাবা তথা ভারতবর্ষের জীবনে অবিস্মরণীয় হয়ে আছে। এই বছর জেনিভাতে শান্তির কাজে পরমাণু-শক্তি সংক্রান্ত প্রথম আন্তর্জাতিক সম্মেলন বসল[১]। এই স্মরণীয় সম্মেলনে সর্ববাদী সম্মতিক্রমে ভারতের ভাবা সভাপতিত্ব করেছিলেন। এইখানে উল্লেখ্য যে কলম্বো প্ল্যান অনুসারে ট্রমবেতে ভারত-কানাডা যৌথভাবে একটি বৃহদাকার রিয়্যাক্টার তৈরি করার পরিকল্পনা গ্রহণ করে।

---

১. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তৎকালীন প্রেসিডেণ্ট আইজেন হাওয়ারের উদ্যোগে এই ঐতিহাসিক সম্মেলনটি হয়েছিল।

জেনিভাতেই এই পরিকল্পনা সম্পর্কে চূড়ান্ত আলোচনা হয়। ভারতের পক্ষ থেকে কানাডার প্রতিনিধির সঙ্গে এই আলোচনা চালিয়েছিলেন ডক্টর ভাবা। এই পরিকল্পনাকে রূপায়িত করতে দশ কোটি টাকার প্রয়োজন ছিল। ভারত সরকার এই খরচের অর্ধেক বহন করবেন আর বাকী অর্ধেক দেবেন কানাডা-সরকার—এই ঠিক হয় সেই আলোচনা বৈঠকে। এই পারস্পরিক সহযোগিতা অনুমোদন করবার জন্য জেনিভা থেকে ডক্টর ভাবা ১৯৫৫ সালের ২৯ অগস্ট তারিখে দিল্লীতে নেহরুর কাছে একটি তারবার্তা পাঠিয়েছিলেন। পয়লা সেপ্টেম্বর জেনিভায় ভাবার কাছে এই প্রকল্পের অনুমোদন পৌঁছে গেল।

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, এই জেনিভা সম্মেলনেই ডক্টর ভাবা তাঁর ভাষণে মানুষ ও সমাজের কল্যাণের জন্য পরমাণুকে শান্তির কাজে ব্যবহারের আবেদন জানিয়েছিলেন। পারমাণবিক শক্তির দ্বারা কৃষি উৎপাদন ও সেচের উন্নয়নের জন্য তাঁর পরিকল্পনা তিনি বিস্তৃত ভাবে ব্যাখ্যা করেন বিশ্বের সমাগত বিজ্ঞানীদের কাছে। এর ফলে সেই আন্তর্জাতিক বৈঠকে ভারতের ভাবমূর্তি (Image) খুব উজ্জ্বল হয়েছিল এবং এজন্য নেহরুর কাছ থেকে অজস্র প্রশংসা লাভ করেন ভাবা।

১৯৬০, ১০ জুলাই। তৈরি হলো ট্রমবেতে ভারতের দ্বিতীয় রিয়্যাক্টর। এক হাজার দুশো ভারতীয় এঞ্জিনীয়ার ও বৈজ্ঞানিক এবং ত্রিশ জন কানাডার কর্মী মিলে এই বৃহদাকার রিয়্যাক্টারটি তৈরি করে ছিলেন। ভারত-কানাডা যৌথ প্রয়াশে তৈরি এই রিয়্যাক্টরটির নাম দেওয়া হয়েছিল clrus এবং এই চুক্তি শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও উভয় দেশের মধ্যে পরে আরো দুটি চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল। ভারত-কানাডা রিয়্যাক্টরের ট্রমবেতে ১৯৬১ সালে যে তৃতীয় রিয়্যাক্টরটি তৈরি হয় তার নাম দেওয়া হয় 'জারলিনা'। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে এর পরিকল্পনা থেকে নির্মাণ কার্য পর্যন্ত—সবটাই ভারতীয় বিজ্ঞানী

ও এঞ্জিনীয়ারদের দ্বারা সম্পন্ন হয়েছিল। ট্রমবের এই সাফল্যের জন্য ভাবা খুব গর্ব বোধ করতেন।

ট্রমবের পরমাণু গবেষণা কেন্দ্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানীদের সাফল্যের পরিচয় আরো আছে। ভাবার নেতৃত্বে তাঁরা যে সব জটিল উৎপাদন প্ল্যাণ্টের পরিকল্পনা ও নির্মাণ কার্যে হস্তক্ষেপ করে সফল হয়েছিলেন সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো— (১) থোরিয়াম প্ল্যাণ্ট (১৯৫৫), থোরিয়াম নাইট্রেট উৎপাদনের জন্য পৃথিবীতে যে কয়টি বৃহত্তম প্ল্যাণ্ট আছে, এটি তার মধ্যে একটি। ভারতবর্ষে গ্যাস ম্যাণ্টল শিল্পের সমগ্র চাহিদা পূরণ করে, ভারত য়ুরোপ ও আমেরিকার বাজারে থোরিয়াম রপ্তানি করে থাকে। (২) ইউরেনিয়াম মেটাল প্ল্যাণ্ট (১৯৫৯)—এই প্ল্যাণ্টে বছরে ত্রিশ টনের মতো নিউক্লিয়ার পর্যায়ের ইউরেনিয়াম তৈরি হয়। (৩) ফুয়েল এলিমেণ্ট ফ্যাব্রিকেশন ফেসিলিটি (১৯৫৯)—সোভিয়েত রাশিয়ার বাইরে এশিয়াতে এই জাতীয় প্ল্যাণ্ট এই প্রথম। ভারতীয় বৈজ্ঞানিকরাই এটি তৈরি করেন। (৪) হেভি ওয়াটার রিকনস-ট্রাকসান (১৯৬২)। (৫) হেভি ওয়াটার প্ল্যাণ্ট (১৯৬২) এশিয়াতে তৈরি এই জাতীয় প্ল্যাণ্ট এই প্রথম ; এখানে বছরে পনর টন করে হেভি ওয়াটার তৈরি হয়। (৬) প্লুটোনিয়াম প্ল্যাণ্ট (১৯৬৫) পারমাণবিক ভারতের একটি বড় দিক্‌চিহ্ন এটি।

একে ভাবার অক্ষয় কীর্তিও বলা চলে। প্লুটোনিয়াম প্ল্যাণ্ট, ভারতকে বিশ্বের অন্যতম পারমাণবিক শক্তিধরের মর্যাদা এনে দিয়েছে। হোমি ভাবা শুধু এই একটি ব্যাপারেই সারা এশিয়ায় ভারতকে ঈর্ষার পাত্র করে দিয়ে গেছেন। দু-দুটো পরমাণু বোমার বিস্ফোরণ ঘটিয়েও চীন যেখানে পৌঁছতে পারেনি ভারত সেখানে পৌঁছেছে এবং তার জন্য একটি লোকের অবদানই স্মরণ করতে হয়। ভারতের পরমাণু বোমা তৈরি করার প্রসঙ্গে ১৯৬৪ সালে যখন তর্কের ঝড় ওঠে তখন ভাবা এক বেতার বক্তৃতায় বলেছিলেন—নিকট ভবিষ্যতে

বা দূর ভবিষ্যতে ভারতকে যদি পারমাণবিক আক্রমণ রুখতে হয়, তাহলে তাকে প্রত্যাঘাত করার ক্ষমতা অর্জন করতে হবে। এই অস্ত্র যার থাকবে তাকে আক্রমণ করা শক্তিমানের পক্ষেও শক্ত হয়ে পড়বে।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে চতুর্থ যোজনায় ভারতকে পারমাণবিক ক্ষমতায় আরো শক্তিশালী করে তোলার জন্য ভাবা এক বিরাট পরিকল্পনা রচনা করেছিলেন। কিন্তু তাকে সম্পূর্ণভাবে রূপ দেবার আগেই তাঁকে ভারত চিরকালের জন্য হারায়। ভবিষ্যৎ ভারত পারমাণবিক যুগের সঙ্গে তাল রেখে অগ্রগণ্য দেশের পাশেই যে রয়েছে সে শুধু একটি লোকের জন্য।

হোমি ভাবার কাছে ভারতের ঋণ শোধ করার নয়।

১৯৬৬, ২৪ জানুআরি।

বিশ্বদূত রয়টার এক মর্মান্তিক দুঃসংবাদ পরিবেশন করল। সেদিনের প্রভাতী সংবাদপত্রের প্রথম পৃষ্ঠায় যে দুঃসংবাদটি পাঠ করে সমস্ত ভারতবাসী শোকাভিভূত হয়ে পড়েছিল সেটি হলো এক বিমান দুর্ঘটনায় ভাবার মৃত্যু। সংবাদে বলা হয়েছিল—২৪ জানুআরি সকালে আলপস্ পর্বতমালার মঁ ব্লাঁ (Mont Blanc) পর্বতশৃঙ্গে এয়ার ইণ্ডিয়ার 'কাঞ্চনজঙ্ঘা' (বোয়িং ৭০৭ জেট) ভেঙে পড়েছে। ১১৭ জন নিহতদের মধ্যে ছিলেন বিশ্ববিখ্যাত পরমাণু বিজ্ঞানী এবং ভারতীয় পরমাণু কমিশনের চেয়ারম্যান ডক্টর হোমি জাহাঙ্গীর ভাবা। তুষার ঝড়ের মধ্যে পড়ে গিয়ে এই দুর্ঘটনা ঘটে।'

ডক্টর ভাবা এই বিমানে আন্তর্জাতিক শান্তি কমিশনের বৈঠকে যোগদান করবার জন্য ভিয়েনা যাচ্ছিলেন। তাঁর যাবার কথা ছিল ২২ জানুআরি, শনিবার, কিন্তু শেষ মুহূর্তে তাঁর যাত্রা একদিনের জন্য স্থগিত রাখেন। একেই বলে নিয়তি। দুর্ঘটনার সংবাদ জানার পর

কয়েক ঘণ্টা ধরে দুর্ঘটনা-স্থলের খুব নীচু দিয়ে উড়ে ফরাসী হেলিকপটারের বৈমানিক জানান যে, দুর্ঘটনা কবলিত যাত্রীদের মধ্যে কারো বেঁচে থাকার সম্ভাবনা নেই। বিধ্বস্ত বিমানের ধ্বংসাবশেষ পশ্চিম য়ুরোপের উচ্চতম পর্বতশীর্ষের অনেক দূরে বিস্তৃত এলাকা জুড়ে এখানে ওখানে বিক্ষিপ্ত অবস্থার ছড়িয়ে থাকতে দেখা গিয়েছে—কিন্তু প্রাণের চিহ্ন কোথাও দেখা যায়নি। এইভাবে এক ভারতীয় বিজ্ঞানীর অমূল্য জীবনের অকালে আকস্মিক ভাবে অবসান ঘটে। কিন্তু ভারতবাসীর স্মৃতিতে 'হোমি জাহাঙ্গীর ভাবা' এই নামটি অম্লান হয়ে বিরাজ করবে।

॥ ছয় ॥

'মানুষ এবং সমাজের কল্যাণ সাধনই হলো প্রকৃত বিজ্ঞানীর জীবনের লক্ষ্য। এই-ই তার ধর্ম।' এই কথা বলেছিলেন এ যুগের মহাবিজ্ঞানী আইনস্টাইন। হোমি জাহাঙ্গীর ভাবার জীবন আলোচনা করলে আমরা দেখতে পাব যে, তাঁরও জীবনের লক্ষ্য এবং ধর্ম ছিল এই। আর এই লক্ষ্য সাধনে তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তিনি একজন মৌলিক গবেষক ছিলেন এবং গবেষণা নিয়েই তিনি যদি থাকতেন তাহলে বিজ্ঞান-জগতে তিনি আরো কিছু দিয়ে যেতে পারতেন। সে প্রতিভা তাঁর ছিল। মহাজাগতিক রশ্মি বা Cosmic ray সম্পর্কিত গবেষণা তাঁকে আন্তর্জাতিক খ্যাতি ও স্বীকৃতি এনে দিয়েছিল।

এইসব গবেষণাকার্য থেকে পরমাণু-কেন্দ্রিকের রহস্য সম্পর্কে ভাবার আগ্রহের সুনিশ্চিত পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর এই আগ্রহই সম্ভবত ভারতে পরমাণু-শক্তির উন্নয়ন ও শান্তির কাজে তার প্রয়োগের দায়িত্ব গ্রহণে তাঁকে উদ্বুদ্ধ করেছিল। আগেই বলেছি, ১৯৪০ সালের দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শুরুতে ভাবা ভারতে আসেন, কিন্তু মুখ্যত এই যুদ্ধের জন্যই ভাবা আর কেমব্রিজে ফিরে যেতে পারেন নি। এর ফলে তিনি

ভারতীয় বিজ্ঞানীদের সংস্পর্শে আসেন এবং মাতৃভূমির প্রতি তাঁর অনুরাগ বর্ধিত হয়। ডক্টর ভাবা মূলত গাণিতিক পদার্থবিদ হলেও পদার্থবিদ্যার প্রয়োগ-ক্ষেত্রেও তাঁর সমান আগ্রহ ছিল। বোধ হয় সে কারণেই তিনি ট্রমবের পরমাণু-শক্তি সংস্থার (Atomic Energy Centre) উন্নয়নে এতখানি সাফল্য লাভ করেছিলেন। শান্তির কাজে পরমাণু শক্তির উন্নয়নের নতুন দায়িত্ব নিয়ে সম্পূর্ণ ব্যাপৃত থাকা সত্ত্বেও ডক্টর ভাবা কণিকা পদার্থবিদ্যা, মহা-জাগতিক বিকিরণ সংক্রান্ত গাণিতিক সমস্যা নিয়ে সমানভাবে চিন্তা করতেন। তিনি ছিলেন চিন্তাশীল ব্যক্তি। বিজ্ঞানী মাত্রেই কম-বেশী চিন্তাশীল হয়ে থাকেন। বিজ্ঞানী হিসাবে তাঁর কৃতিত্বের কারণ হয়ত এই যে, আইনস্টাইনের মতো, ভাবাও অনেক সময়ই গণিতের স্বপ্ন দেখতে পারতেন এবং পদার্থবিজ্ঞানের সমস্যা কার্যত সমাধানের আগেই তার গাণিতিক মীমাংসার প্রকৃতি সম্পর্কে ধারণা করতে পারতেন।

ট্রমবের বর্তমান পরিচালক ডক্টর আর রমন্না বলেন—'ডক্টর ভাবা ছিলেন একজন সুদক্ষ সংগঠক। তিনি সর্বদাই হাসি মুখে সকলের সংসর্গে আসতেন। তিনি ভাল সাঁতার জানতেন এবং অবসর সময়ে ছবি আঁকতেন। কলা ও সংগীতরসিক ডক্টর ভাবা ভারতীয় নৃত্যে একজন গভীর অনুরাগী ছিলেন। তিনি স্থাপত্যবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। কয়েকবার তিনি টাটা ইনস্টিটিউটের ও পরমাণু শক্তি সংস্থার বীক্ষণাগার ও ভবনাদির পরিকল্পনা ও নক্সা রচনা করেছিলেন। তিনি ছিলেন একাধারে বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞান-সংগঠক। কাজের মধ্যে তিনি উদ্যম ও উৎসাহের সঞ্চার করতে পারতেন। ভারতকে এক উচ্চতর বৈজ্ঞানিক স্তরে উন্নীত করবার তাঁর যে আকাঙ্ক্ষা ছিল, তা সার্থক হতে পারে যদি এদেশের বিজ্ঞান-কর্মীরা তাঁর আদর্শের অনুসরণ করেন।'

ভাবার মৃত্যুর পর দি স্টেটসম্যান পত্রিকায় লেখা হয়েছিল—'There was in him an extremely rare combination

of individual brilliance, a passion for organised development supported by unbounded energy and above and a remarkable ability to lead and inspire people associated with him. His own scientific work had in recent years been overshadowed by his organizational achievements, but it should not be forgotten that Dr. Homi Bhabha was already physicist of a very high calibre before he achieved eminence as the builder of the Indian Atomic Energy Programme.' (তাঁর মধ্যে কতকগুলি দুর্লভ গুণের সমাবেশ ঘটেছিল। ব্যক্তিগত প্রতিভার সঙ্গে মিলে ছিল সংঘবদ্ধ ভাবে কাজ করার একটা প্রবল আগ্রহ। তাঁর সংগে সংশ্লিষ্ট প্রত্যেক কর্মীকে নেতৃত্ব দেবার ও তাদের উৎসাহিত করার আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল তাঁর। ইদানীং কালে সংঘবদ্ধ প্রয়াসের দরুণ ডক্টর ভাবার নিজস্ব বৈজ্ঞানিক কাজ অনেক পরিমাণে ব্যাহত হয়েছিল। তবে এ কথা বিস্মৃত হওয়া উচিত নয় যে, ভারতীয় পরমাণু-শক্তির কার্যসূচীর নির্মাতা হিসাবে প্রতিষ্ঠালাভ করার আগে তিনি ছিলেন একজন উচ্চ শ্রেণীর পদার্থবিদ।')

মৃত্যু সময়েও ভাবা ছিলেন আন্তর্জাতিক পারমাণবিক শক্তি কমিশনের বৈজ্ঞানিক উপদেষ্টা কমিটির সদস্য, ভারতের পারমাণবিক শক্তি কমিশনের চেয়ারম্যান, ভারত সরকারের পারমাণবিক শক্তি দফতরের সচিব এবং ট্রমবেতে পারমাণবিক গবেষণা কেন্দ্রের পরিচালক। এতগুলি দায়িত্ব যিনি বহন করতেন সেই মানুষটির কর্মক্ষমতার কথা চিন্তা করলে সত্যিই বিস্মিত হতে হয়—বিস্মিত হতে হয় তাঁর কর্তব্যনিষ্ঠার কথা ভেবে। 'India's Bhabha'—বিদেশে এই নামেই পরিচিত ছিলেন হোমি জাহাঙ্গীর ভাবা। বিদেশে যখনই তিনি কথা বলতেন বিশ্বের বিজ্ঞান পণ্ডিতরা গভীরভাবে তা শুনতেন। কারণ

তাঁরা সবাই জানতেন, ভাবা যখন কথা বলেন, তখন অনুমান করাও দুঃসাধ্য যে, শান্তি ছাড়া আণবিক শক্তির অন্য কোন লক্ষ্য থাকতে পারে। তবু যখন আমরা বলি আঠারো মাসেই ভারত পরমাণু বোমা তৈরি করতে পারে, তখন পরোক্ষে শ্রদ্ধা জানাই এই অসাধারণ কর্মী বৈজ্ঞানিকের প্রতি। পারমাণবিক বিজ্ঞানে ভারতকে আজ এতদূর এগিয়ে এনেছেন একা এই মানুষটি। তাইতো বলি, হোমি ভাবার কাছে ভারতের ঋণ শোধ হবার নয়।

নেহেরুর মৃত্যুর পর লাল বাহাদুর শাস্ত্রী তাঁর মন্ত্রিসভায় ডক্টর ভাবাকে পারমাণবিক শক্তি ও বৈজ্ঞানিক দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীরূপে গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি আণবিক শক্তি কমিশনের প্রধান রূপে থাকাই বাঞ্ছনীয় মনে করেছিলেন। অন্য লোকে যখন মন্ত্রিপদ লাভের জন্য লালায়িত হয়, তখন হাতের মুঠোর মধ্যে পেয়েও তিনি তা গ্রহণ করেননি। ভাবার চরিত্রের এই বৈশিষ্ট্য সত্যিই প্রশংসার যোগ্য।

ভাবার ব্যক্তিত্ব ছিল বহুমুখী। আণবিক কমিশনের দ্বিতীয় চেয়ারম্যান হিসাবে ডক্টর বিক্রম সারাভাই বলেছেন, ডক্টর ভাবা জীবনকে সমগ্রভাবে গ্রহণ করেছিলেন ; তাই বিজ্ঞানের পূজারী হয়েও তিনি ছিলেন একজন সৌন্দর্যের উপাসক, কলানুরাগী ব্যক্তি। তিনি শুধু বিজ্ঞানের ভাষা বুঝতেন না, ভারত নাট্যম থেকে আবৃত্তি শুনেও তিনি রীতিমত রোমাঞ্চ অনুভব করতে পারতেন অথবা কোন মন্দিরে প্রস্তর বা ব্রোঞ্জে তৈরি একটি মূর্তি দেখলে তার শিল্প-সুষমায় মুগ্ধ হতেন। তিনি ছিলেন একজন গোটা মানুষ। প্রকৃতিকে ভালবাসা তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ছিল।'

যাঁরাই এই বিজ্ঞানীর ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে এসেছিলেন তাঁরাই জানেন যে ডক্টর সারাভাইয়ের এই উক্তি আদৌ অতিরঞ্জিত নয়। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক প্রত্যেকটি ঘটনাই ভাবার আগ্রহকে সমানভাবে উদ্দীপ্ত

তীর্থের ঠিক উল্টো দিকেই প্রাচীন ভারতের হস্তীগুহা (Elephanta Caves) অবস্থিত। গবেষণা কেন্দ্রের স্থান নির্বাচনে ভাবা যথেষ্টই সৌন্দর্যবোধের পরিচয় দিয়েছিলেন।

এতবড়ো বিজ্ঞানী, কিন্তু সংগীত ও নৃত্যে ভাবার অসামান্য অনুরাগ দেখে তাঁর সতীর্থগণ অবাক হতেন। দক্ষিণ ভারতীয় মার্গসংগীত ও নৃত্যের তিনি বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। যখনই কোথাও গান শুনতে যেতেন তখন তাঁর মা-কে সঙ্গে করে নিয়ে যেতেন। ভারত নাট্যমের প্রখ্যাত শিল্পী শ্রীমতী শান্তা রাও এবং আরো অনেক শিল্পীকে ভাবা প্রয়োজন হলে মুক্তহস্তে অর্থসাহায্য করতেন। তাঁর লাইব্রেরীটি ছিল নানাবিধ মূল্যবান গ্রন্থে পরিপূর্ণ। শুধু যে বিজ্ঞানের বই তা নয়, শিল্প ও সংগীত সম্পর্কেও অনেক বই ছিল এবং সেসব তিনি খুব মনোযোগের সঙ্গেই পাঠ করতেন। বাগান সম্পর্কেও অনেক রকম বই ছিল। ভাবার বাগানের শখ ও বৃক্ষপ্রীতি প্রসিদ্ধ। দেশী-বিদেশী অনেক চিত্রের সংগ্রহ ছিল তাঁর। এর থেকেই বোঝা যায় যে, হোমি জাহাঙ্গীর ভাবা একজন পরিপূর্ণ মানুষ ছিলেন এবং জীবনের সকল দিক সম্পর্কেই ছিল তাঁর গভীর আগ্রহ।

ভাবার মধ্যে বিজ্ঞান ও প্রকৃতির আশ্চর্য সমন্বয় ঘটেছিল। তিনি বহু দেশ ভ্রমণ করেছেন এবং তিনি সেই শ্রেণীর পর্যটক ছিলেন যিনি যেখানেই প্রকৃতিকে অসীম সৌন্দর্য নিয়ে রাজত্ব করতে দেখেছেন সেখানেই তাঁর সৌন্দর্যপিপাসু মন ছুটে যেত—তাঁর দুই চোখ যেন দশ চোখ হয়ে সেই সৌন্দর্য দর্শন করে পরিতৃপ্ত হতো। এই প্রসঙ্গে একটি ঘটনা এখানে বিশেষভাবেই উল্লেখ্য। একবার তিনি জেনিভাতে এম. ভি. কামাথের সঙ্গে আলাপ করছিলেন। কামাথ আলপস পর্বতমালার সুন্দর সৌন্দর্য নিরীক্ষণ করছিলেন; এমন সময়ে ডক্টর ভাবার কণ্ঠস্বর শোনা গেল, এই সৌন্দর্য কি মনোরম নয়? বছরের এই সময়টাতেই আলপসের সৌন্দর্য দেখবার জিনিস।

করত। তাঁর ছেলেবেলার সেই কৌতুকজনক ঘটনাটি আবার মনে করতে হয়। তাঁর ঘুম খুব কম ছিল ; উদ্বিগ্ন পিতামাতা যখন ডাক্তার দেখালেন, তিনি বলেছিলেন—এই ছেলের মস্তিষ্ক অত্যন্ত সক্রিয়। তাইতো দেখি উত্তরকালে এই বিজ্ঞানীর চিন্তা নানা দিকে ধাবিত হতো। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ১৯৬৩ সালের অক্টোবর মাসে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব সায়েন্সের বার্ষিক অধিবেশনের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এই অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে তিনি ভারতের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা সমস্যাটির প্রতি ভারতীয় বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন।

বিজ্ঞানী ভাবার সৌন্দর্যবোধের পরিচয় ওতপ্রোত ভাবে মিশে আছে ট্রমবের গবেষণা কেন্দ্রটির সর্বাঙ্গে। এমন শিল্পসুষমামণ্ডিত গবেষণা-কেন্দ্র ভারতবর্ষে আর দ্বিতীয়টি নেই। অপ্সরা ফটক দিয়ে এখানে কেউ যদি প্রবেশ করে তাহলে সবুজ ঘাসের কার্পেট বিছানো প্রশস্ত ও পরিচ্ছন্ন লন্‌টি (Lawn) দেখলেই তার চোখ দুটি জুড়িয়ে যাবে। লনের এখানে-ওখানে নানা রঙের ফুলের গাছ, ছায়াভরা গাছ,—সব কিছু মিলিয়ে অপরূপ সৌন্দর্যমণ্ডিত একটি শান্ত পরিবেশ। কে বলবে যে এইখানেই চলছে আনবিক শক্তির মতো একটি জটিল ও কঠিন বিষয়ের গবেষণা। একজন বিদেশী দর্শক ট্রমবে পরিদর্শন করে এই মন্তব্যটি করেছিলেন—'It is impossible to describe the loveliness of the layout ; it is something that has to be experienced' অর্থাৎ, এই স্থানটির মনোরম বিন্যাস ভাষায় বর্ণনা করা অসম্ভব, এ শুধু দুই চোখ দিয়ে দেখবার জিনিস। জনাকীর্ণ শহর থেকে বহুদূরে সমুদ্রের তীরে অবস্থিত ট্রমবে কেন্দ্রটির অন্যদিকে সুউচ্চ পর্বতটির অনেকখানি ছায়ানিবিড় গাছে ঢাকা। দূর থেকে দেখলে এটিকে একটি শান্ত তপোবন বলেই মনে হবে। বিরাট প্লুটোনিয়াম প্ল্যাণ্টটি দেখলে যে কোন দর্শকই বিস্ময়ে অভিভূত হবেন। আধুনিক ভারতের এই নবীন

কিছুদিন বাদে ভাবা আবার তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কখনো মঁ ব্ল্যা-র ওপরে উঠেছেন ?

—না। আমি মালাবার হিলেই দম না নিয়ে উঠতে পারি না।

—আপনি একবার ওখানে উঠে দেখবেন। পৃথিবীতে এমন সৌন্দর্য এক হিমালয় ছাড়া আর কোথাও দেখতে পাওয়া যায় না।

এর অল্প দিন পরেই আন্তর্জাতিক খ্যাতি-সম্পন্ন এয়ার-ইণ্ডিয়ার 'কাঞ্চনজঙ্ঘা' প্লেনে চড়ে (একজন দক্ষ পাইলট ছিলেন এর পরিচালক) ভাবা ঐ দুরারোহ মঁ ব্ল্যা পর্বত-শৃঙ্গে গিয়েছিলেন, কিন্তু তিনি আর ফিরে আসেননি সেখান থেকে। যিনি অমন গভীর অনুরাগের সঙ্গে প্রকৃতিকে ভালবাসতেন সেই প্রকৃতিরই একটি নির্জনতম স্থানে তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন তাঁর শাশ্বত আশ্রয়। তুষারাচ্ছাদিত নির্জন মঁ ব্ল্যার ক্রোড়ে বসে হিমালয়ের প্রাচীন ঋষিদের মতো বিজ্ঞানী ভাবা কি পরমাণুর চিন্তাতেই সমাহিত হলেন। সারাজীবন যিনি পরমাণুর গবেষণায় অতিবাহিত করেছেন, যে পরমাণু ছিল তাঁর দিবসের চিন্তা ও রাত্রির স্বপ্ন এবং যার শক্তিকে তিনি শান্তির কাজে প্রয়োগের কথাই ভাবতেন সেই বিচিত্র পদার্থের মধ্যে এইভাবে বিলীন হয়ে যাওয়াই কি এই পরমাণু-বিজ্ঞানীর নিয়তি-নির্দিষ্ট পরিণতি ছিল ?

ভাবার অন্তঃকরণ কি রকম কোমল ছিল তারই একটা দৃষ্টান্ত উল্লেখ করি। যে কোন লোক দুঃখ কষ্টে পড়ুক তিনি তার জন্য কিছু না কিছু করবার জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকতেন। একবার তিনি জানতে পারলেন যে ট্রমবের একজন কর্মী হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়েছে এবং ভারতবর্ষে চিকিৎসা করিয়ে আরোগ্যলাভ করা আদৌ সম্ভব নয়। তখন ডক্টর ভাবা সেই কর্মীটিকে তাঁর নিজের খরচে আমেরিকায় পাঠিয়ে দিলেন এবং সেখানকার একটি ভালো হাসপাতালে তাঁর

চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। লোকটি সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করে যখন দেশে ফিরে একদিন ডক্টর ভাবাকে তাঁর কৃতজ্ঞতা নিবেদন করতে এলেন তখন ভাবা তাঁকে বলেছিলেন, 'আমি বরং আপনার জন্য এটুকু করতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করছি।'

যে বছর ভাবার মৃত্যু হয় ঠিক সেই বছরের ১০ জানুআরি তাশখন্দে ভারতের দ্বিতীয় প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী আকস্মিক ভাবে মারা যান। তাঁর মৃত্যুর ঠিক দু'দিন আগে অর্থাৎ ২২ জানুআরি ট্রমবেতে অনুষ্ঠিত এক শোকসভায় শাস্ত্রীজীর স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করতে গিয়ে ভাবা একটি কথাও বলতে পারেন নি—এমনই শোকাভিভূত হয়েছিলেন তিনি। ২৩ জানুআরি ১৯৬৬ সালে জেনিভা যাত্রার ঠিক একদিন আগে ভাবা শ্রীমতী ললিতা শাস্ত্রীকে যে চিঠিখানি লিখেছিলেন (জীবনে এইটিই ছিল ভাবার শেষ পত্র) তার প্রতিটি বাক্যে প্রকাশ পেয়েছে শাস্ত্রীজীর প্রতি তাঁর অসীম শ্রদ্ধা। তিনি লিখেছিলেন— 'পণ্ডিতজীর জীবিতকালেই যখন থেকে শাস্ত্রীজী দপ্তরবিহীন মন্ত্রী নিযুক্ত হয়েছিলেন তখন থেকে তাঁর সঙ্গে কাজ করার সুযোগ আমার হয়েছিল ; পরমাণু-শক্তি বিভাগটির দায়িত্ব তাঁর ওপরই দেওয়া হয়েছিল। তাঁর নম্র ব্যবহার, বিনয়, সভ্যতা এবং চারিত্রিক কাঠিন্য আমার মতো সকলের কাছেই তাঁকে প্রিয় করে তুলেছিল যাঁদের সুযোগ হয়েছিল তাঁর সঙ্গে কাজ করতে। এই সময় তাঁর মতো একজন যথার্থ শ্রেষ্ঠ ও সাহসী মানুষকে হারিয়ে ভারতবর্ষ সত্যিই রিক্ত বোধ করছে। সমগ্র জাতি আজ আপনার শোকের অংশীদার। আমি যদি আপনার কোন কাজে আসতে পারি তাহলে নির্দ্বিধায় আপনি জানাবেন। কিছু করতে পারলে আমি নিজেকে কৃতার্থ মনে করব।'

১৯৬৭, ১২ জানুআরি।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ভাবার জীবনব্যাপী কর্মকৃতির স্বীকৃতি হিসাবে ট্রমবের কেন্দ্রটির নতুন নামকরণ করেন—ভাবা অ্যাটমিক রিসার্চ সেণ্টার'। ভারতের বিজয়স্তম্ভ যেমন এই কেন্দ্রটি তেমনি হোমি জাহাঙ্গীর ভাবার জীবনব্যাপী বিজ্ঞান সাধনার শ্রেষ্ঠ কীর্তি। কিন্তু এই কীর্তির চেয়েও মহৎ ছিলেন মানুষ ভাবা। সম্পূর্ণ মানুষ সুন্দর মানুষ। চিরকাল মনে রাখার মতো মানুষ। এমন মানুষকে অঙ্কে ধারণ করে ভারতবর্ষ ধন্য হয়েছে।
